অনীক

মার্চ ২০১২
বর্ষ ৪৮ q সংখ্যা ৯

সম্পাদকীয় q ১

ঘটনাপ্রবাহ
তসলিমা-র '*নির্বাসন*'-এর নির্বাসন ❑ ২
প্রাক বাজেট চিত্র : ভারতীয় অর্থনীতি ❑ ৩

এখন পশ্চিমবঙ্গ
সংবাদমাধ্যমের দায় ❑ মালবিকা মিত্র ❑ ৭
তপ্ত তাওয়া কিংবা ফুটন্ত... ❑ সন্দীপ ❑ ৯
বিদ্যাস্থানে ভয় ❑ মালবিকা সাহা ❑ ১২
পরিবর্তনের পশ্চিমবঙ্গে ❑ গৌতম সেনগুপ্ত ❑ ১৭
পঃবঙ্গে সরকারি স্বাস্থ্যপরিষেবা ❑ সিদ্ধার্থ গুপ্ত ❑ ১৯

শতবর্ষে স্মরণ
শতবর্ষে দেবব্রত বিশ্বাস ❑ প্রিয়দর্শী চক্রবর্তী ❑ ২৫
প্রসঙ্গ : সুধী প্রধান ❑ দীপংকর চক্রবর্তী ❑ ২৯
জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ❑ সুস্মিতা রায়চৌধুরী(মৈত্র) ❑ ৩৭

স্মরণ
পুঁজিবাদী উন্নয়ন দেখা—কল্যাণ সান্যালের চোখে
❑ অঞ্জন চক্রবর্তী ❑ ৫

শতবর্ষে নারীদিবস
নারীদিবস, ফেব্রুয়ারি ১৯১৩ ❑
আলেক্সান্দ্রা কলন্তাই ❑ ৩৯

যোগাযোগ, লেখা, চিঠিপত্র ও
টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা :
প্রযত্নে/পিপলস বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৪৩২৮৭৭৫৬০
গ্রাহকদের যোগাযোগ : ৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpotrika.wordpress.com

কার্যালয় :
১১, রাজা রামমোহন সরণী। কলকাতা ৭০০ ০০৯
(মঙ্গলবার : সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে আটটা)

সম্পাদকমণ্ডলী : **দীপংকর চক্রবর্তী রতন খাসনবিশ সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস প্রণব**

নীল কিন্তু যন্ত্রণার-ই রং!

গত আঠাশে ফেব্রুয়ারি দেশের প্রায় সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেডইউনিয়নগুলি সারা দেশে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। দীর্ঘ দিন ধরে লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে মেহনতি মানুষদের অর্জিত বিভিন্ন অধিকারগুলির উপর এদেশের রংবেরঙের বিশ্বায়নপন্থী কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলি ধারাবাহিকভাবে উদারনৈতিক অর্থনীতিবাদী পন্থার অনুসরণে ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে একের পর এক সেগুলিকে কেড়ে নিচ্ছে। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোটাই ছিল এই ধর্মঘটের মূল লক্ষ্য। যে কারণে এমনকি কেন্দ্রে ও অধিকাংশ রাজ্যে ক্ষমতাসীন দলগুলির প্রভাবিত ট্রেড ইউনিয়নগুলি পর্যন্ত এই ধর্মঘটে সামিল হয়েছিল। অতীতে বা বর্তমানেও ক্ষমতাসীন দলগুলির সরকারগুলির সেই শ্রমিকশ্রেণী-বিরোধী পদক্ষেপগুলিকে কার্যকর করার উদ্যোগ, আবার তাদেরই প্রভাবিত ট্রেডইউনিয়নগুলির সেগুলির কার্যত রুটিনসর্বস্ব বিরোধিতার মধ্যে নিহিত স্ব-বিরোধিতা ও দ্বিচারিতার কারণে কারও কারও এই ধর্মঘটকে সমর্থনের ব্যাপারে কিছু দ্বিধা বা প্রশ্ন অবশ্যই ছিল। মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ধর্মঘটকে সমর্থন বা বিরোধিতা করার ব্যাপারে প্রত্যেকের স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবার বদলে ভয় দেখিয়ে বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বাধ্য করার প্রচলিত রীতির বিরোধী অবস্থানও স্বাভাবিকভাবেই ছিল। কিন্তু তাই বলে একমাত্র মালিকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ এবং সচেতন বা অচেতন সেবাদাস ছাড়া কোনো গণতান্ত্রিক মানুষের পক্ষেই এই দাবিগুলির বিরোধিতা করার প্রশ্ন ছিল না।

কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ন'মাস আগে সিপিআই(এম)-স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্লোগান তুলে ব্যাপক মানুষের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় আসীন মমতা সরকারই শুধু অভূতপূর্ব এক যুদ্ধকালীন তৎপরতায় 'ধর্মঘট-ভাঙা দালাল'-এর ভূমিকা নিয়ে এই ধর্মঘট ব্যর্থ করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লো। সরকারি কর্মচারীদের তো বটেই, এমনকি সরকারি আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলকলেজের শিক্ষকশিক্ষিকাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেবার স্বীকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার কার্যত কেড়ে নিয়ে ক্ষমতার ডান্ডা উঁচিয়ে বাধ্য করা হলো ধর্মঘটের দিন কাজে যোগ দিতে। ফলত ন্যূনতম গণতান্ত্রিক চেতনাবিশিষ্ট মানুষের সামনে খোলা রইলো শুধুমাত্র একটিই বিকল্প : 'মমতাময়ী' তৃণমূলী সরকারের এই স্বৈরতন্ত্রী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ধিক্কারে সোচ্চার হওয়া। '*অনীক*'-ও সেই প্রতিবাদী ঐকতানে নিজের ক্ষুদ্র কণ্ঠ যুক্ত করছে।

তাছাড়া এ কথা মাত্র ন'মাসের মধ্যে ব্যাপক মানুষের পক্ষে তো ভুলে যাওয়া সম্ভব নয় যে, এই মমতা ব্যানার্জী তথা তৃণমূল কংগ্রেসই সিপিআই(এম)-এর দলতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের প্রেরণাসঞ্চারী এবং মূলত দলীয় পতাকাবিহীন গণসংগ্রামের সমর্থকের ভূমিকা নিয়ে বার বার প্রতিবাদী ধর্মঘট-সহ নানরকম বামপন্থী স্লোগান তুলে ও কর্মসূচি নিয়ে নিজেদের পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে সমর্থ হয়েছিল। তাদের এই ভূমিকার এবং প্রাসঙ্গিক নানা প্রতিশ্রুতির কারণেই আগের জমানার স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী গণসমর্থন বিগত নির্বাচনে তাদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছিল। সেই সব প্রতিশ্রুতির প্রায় প্রতিটি তারা তো ভঙ্গ করেইছে, এমনকি যে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ঐতিহাসিক লড়াইয়ের ফসলকে আত্মসাৎ করে তারা ক্ষমতায় এসেছে, সেই লড়াইয়ের সৈনিকদের বিরুদ্ধে পূর্বতন সরকারের চাপিয়ে দেওয়া মিথ্যে মামলাগুলি থেকে পর্যন্ত তারা আজ পর্যন্ত মুক্তি পায় নি।

জনশ্রুতি, নতুন সরকারের মূল শক্তি মমতা ব্যানার্জী নাকি কবিতা লেখেন, ছবি আঁকেন, এবং সমগ্র রাজ্য না হোক, অন্তত কলকাতাকে নীল বর্ণে রাঙিয়ে দেবার স্বপ্ন দেখেন। নীল কিন্তু কবির দৃষ্টিতে যন্ত্রণার-ই রং। তাহলে কি ধরে নেবো, রাজ্যবাসীকে সেই যন্ত্রণার গভীরে নিমজ্জিত করাই তাঁর মূল লক্ষ্য

ঘটনা প্রবাহ

তসলিমা-র '*নির্বাসন*'-এর নির্বাসন

গত ১ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বইমেলা কর্তৃপক্ষ স্রেফ চক্রান্তমূলক-ভাবে তসলিমার আত্মজীবনী সিরিজের সপ্তম খণ্ড '*নির্বাসন*'-এর প্রকাশ অনুষ্ঠান বাতিল করে দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে : *সেই ট্র্যাডিশনই চলছে* !

সেদিনের অনুষ্ঠানের জন্য বইমেলার এসি হলের নির্ধারিত ভাড়া জমা দিয়ে বইটির প্রকাশক পিপলস্ বুক সোসাইটি প্রয়োজনীয় লিখিত অনুমতি পেয়েছিল। অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময় বেলা তিনটের ঘন্টা দু'-তিন আগে কর্তৃপক্ষ প্রকাশককে জানান যে, হলটি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা যায় নি, তাই দেওয়া যাচ্ছে না। পরে প্রমাণ মিলেছে, অজুহাতটি ছিল নিতান্তই মনগড়া। পরে বইমেলা কমিটিরই একজন পদাধিকারী স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন: পুলিশ জানিয়েছে, মৌলবাদীরা বইটির প্রকাশে আপত্তি জানাচ্ছে, এ নিয়ে গন্ডগোল হতে পারে, তাই অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ মৌলবাদীদের আপত্তির জুজু দেখিয়ে পুলিশের নির্দেশেই সেদিন অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছিল। এর আরেকটি প্রমাণ, বইমেলা কর্তৃপক্ষের সাথে সাথে সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে পুলিশও সেদিন বইটির নির্ধারিত উদ্বোধক নাট্যব্যক্তিত্ব রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তকে অনুষ্ঠানটি বাতিল করার কথা জানিয়ে তাঁকে আসতে বারণ করেছিল। কারণ, মুখ্যমন্ত্রী নাকি 'চান নি' যে, এ নিয়ে বইমেলায় 'অশান্তি' হোক!

বই প্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর ন্যক্কারজনক আক্রমণের এই ঘটনা স্বভাবতই আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় মাত্র চার বছর আগেকার এরকমই একটি ন্যক্কারজনক আক্রমণের ঘটনার কথা, এবং সেখানেও তার লক্ষ্য ছিলেন এই তসলিমাই। ২০০৭-এর নভেম্বরে এরকম মৌলবাদী আক্রমণের পুলিশি আশংকার জিগির তুলেই তৎকালীন 'সংস্কৃতিপ্রেমিক' মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মৌলবাদীদের পদতলে মাথা নত করে সম্পূর্ণ অন্যায় ও অগণতান্ত্রিকভাবে স্বৈরতন্ত্রী কায়দায় পুলিশ দিয়ে তসলিমাকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে 'বহিষ্কৃত' করার ব্যবস্থা করে-ছিলেন। এরও আগে তাঁর আত্মজীবনী সিরিজের তৃতীয় খণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সেই সরকার মৌলবাদীদের ফতোয়াকেই কার্যত মদত দিয়েছিল। কলকাতা হাইকোর্ট কিন্তু সেই অন্যায় নিষিদ্ধকরণের সরকারি ফতোয়াকে বাতিল করে দিয়েছিল, ব্যাপক পাঠকসমাজও বিপুল সংখ্যায় তসলিমার আত্মজীবনীর খণ্ডগুলি কিনে তাঁদের রায় জানিয়েছিলেন।

আজও সেই একই ট্র্যাডিশন চলছে। অতি সম্প্রতি রাজস্থানে একই কায়দায় ও একই অজুহাতে ঔপন্যাসিক সলমন রুশদি-কে আসার অনুমতি, এমনকি ভিডিও সম্মেলন করার অধিকার থেকেও বঞ্চনা করার ঘটনা সারা দুনিয়ার মানুষের ধিক্কার অর্জন করেছে। কিন্তু কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের বইপ্রেমিক গণতান্ত্রিক মানুষদেরকে অভিনন্দন জানাই, কারণ তাঁরা রাজস্থানের ঘটনার মতো চুপ করে বসে থাকেন নি। সারা দুনিয়ার সামনে কলকাতাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচাবার প্রচেষ্টায় তাঁরা সেদিন 'নির্বাসন' প্রকাশ অনুষ্ঠান বাতিল হবার পরেই বইমেলায় মিছিল করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, তসলিমাকে এই রাজ্যে ফিরিয়ে আনার দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। সেদিনই প্রকাশকের স্টলের সামনে আকাদেমি পুরস্কার-বিজেতা কবি ও কথা-সাহিত্যিক নবারুণ ভট্টাচার্য '*নির্বাসন*' গ্রন্থটি প্রকাশ করে দিয়েছেন কয়েকশো গণতান্ত্রিক বইপ্রেমিক মানুষের সহর্ষ হাততালির মধ্যে। মুষ্টিমেয় মৌলবাদী তথা বইমেলা কর্তৃপক্ষ তথা পুলিশ তথা সরকার সংখ্যালঘুদের মানসিকতায় আঘাতের যে অজুহাত তুলেছে, সেদিনকার সেই প্রকাশ অনুষ্ঠানে বেশ কিছু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন, দাবি করেছেন: এভাবে মুষ্টিমেয় মৌলবাদীদের সামনে মাথা নত করে কার্যত সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করা চলবে না। আমাদেরও সেটাই দাবি। সাথে সাথে আসুন আমরা হাজার কণ্ঠে দাবি করি: এভাবে বার বার গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করা চলবে না, চলবে না মুষ্টিমেয় মৌলবাদীদের সামনে মাথা নত করা— তসলিমাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। উল্লেখ্য যে, এমনকি বাংলাদেশেও নির্বিঘ্নে '*নির্বাসন*' প্রকাশিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে মাত্র আট মাস আগে নতুন সরকার ক্ষমতা পেয়েছেন মূলত পূর্ববর্তী সরকারের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের প্রক্রিয়ার অবসান ঘটাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে— নতুন করে গণতন্ত্র হরণের জন্য নয়। অথচ সিপিআই(এম)-স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্লোগান তুলে ক্ষমতায় আসীন মমতা সরকার আগেকার বামফ্রন্ট জমানারই নির্লজ্জ অনুকরণ করে প্রমাণ করে দিয়েছেন : গণতন্ত্র নয়— বরং তাদেরও মূল বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে ক্ষমতার গদি, এবং তা বজায় রাখার তাগিদেই তারা মৌলবাদীদের নিয়ন্ত্রিত পিছিয়ে-থাকা মানসিকতার কিছু সংখ্যালঘু মানুষদের সমর্থনের প্রত্যাশায় প্রয়োজন বুঝলে মৌলবাদীদের সামনে মাথা নত করতে সামান্য দ্বিধা দেখাতে রাজি নন।

২০০৭-এ পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরাও ব্যাপক সংখ্যায় তসলিমার ক্ষেত্রে অনুসৃত সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক আচরণের তথা মৌলবাদীদের চক্রান্তের বিরোধিতা করেছিলেন। '*নির্বাসন*'-এর নির্বাসন তাদের অধিকাংশের বিবেককেই কিন্তু তাড়িত করতে পারে নি। ফলত নতুন করে প্রমাণিত হয়ে গেল পুঁজিবাদী সমাজে নাগরিক সমাজের প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে গ্রামশ্চি'র সেই অমোঘ তত্ত্ব : শেষ বিচারে, নাগরিক সমাজের বৃহত্তর অংশটিই নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে সদা-সর্বদা শাসকশ্রেণীর সেবাদাস হিসেবে তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে চলে— ঠিক যেমন পূর্ববর্তী সিপিআই(এম) জমানার বিদায়-ঘন্টা বেজে উঠবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তারা করে চলেছিল।

দ্বৈপায়ন চতুর্বেদী

প্রাক বাজেট চিত্র : ভারতীয় অর্থনীতি

আগামী ১৬ মার্চ পার্লামেন্টে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ২০১২-১৩ আর্থিক বছরের জন্য বাজেট-প্রস্তাব পেশ করবেন। প্রথানুযায়ী প্রাক-বাজেট রিপোর্টও পেশ করবেন তিনি। যাতে গত আর্থিক বছরে দেশের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। ইউরোপ-আমেরিকার অর্থনৈতিক মন্দার সরাসরি প্রভাবে যে ভারতের বাৎসরিক বৃদ্ধির হার হোঁচট খেয়েছে, বৃদ্ধির হার ৬.৫-এর নীচেই থাকবে, আশা করা যায় এ কথা তিনি স্বীকার করবেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তর ২০১০-১১ আর্থিক বছরের মাথাপিছু আয় সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করেছেন। সেই তথ্যে মাথাপিছু গড় আয় (বাৎসরিক) দেখানো হয়েছে ৫৩ হাজার টাকা। পরিবারের সদস্যসংখ্যা যদি ৫ হয় তবে মাসিক পারিবারিক আয় দাঁড়ায় প্রায় ২২ হাজার টাকা।

যার অর্থ আজকের মূল্যমান বা মূল্যসূচক ধরলে গড় একজন ভারতবাসী সুখের সাগরে ভাসছে। ক্ষুধা নেই, অশিক্ষা নেই, চিকিৎসাহীনতা নেই, বিনাচিকিৎসায় শিশুমৃত্যু নেই। কিন্তু বাস্তব যে নির্মম তা অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের অজানা নয়। আবার উপরের তথ্যটিও বেঠিক নয়। আসলে, দেশের মোট আয়কে (জিডিপি) জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় মাথাপিছু গড় (বাৎসরিক) আয়। এই হিসাবে একদিকে আছেন জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ, যাঁরা বাস করছেন চরম দুর্দশার মধ্যে। অন্যদিকে আছেন প্রভূত সম্পদের অধিকারীদের একজন বড় আম্বানি, যিনি মুম্বাইতে ৪৫০০ কোটি টাকার বসতবাড়ি বানিয়েছেন। কিংবা রাজারহাট বা কলকাতায় যে গুচ্ছ গুচ্ছ ১ কোটি বা ৫০ লাখি বহুতল আবাসন তৈরি হচ্ছে তার ক্রেতারাও আছেন।

এবার দেখা যাক ভারতের জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ কেমন আছেন। প্রথমেই ধরা যাক দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারীদের কথা। জাতীয় যোজনা পর্যদ (প্ল্যানিং কমিশন) দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারীদের সংখ্যা নির্ধারণের মানদণ্ড পরিবর্তন করছেন ক্রমাগত। আগে যারা দৈনিক ২৪০০ কিলো-ক্যালরির কম খাদ্য পেতেন তাঁদের দারিদ্রসীমার নীচে ধরা হত। ২০০৪ সালের পর ২৪০০ কিলো ক্যালরির সীমাকে নামিয়ে করা হলো ২১০০ কিলো-ক্যালরি। কলমের এক খোঁচায় ভারতে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমে গেল, জনসংখ্যার ২৭ শতাংশ নির্দিষ্ট হলেন বিপিএল (Below Poverty Line) হিসাবে।

জাতীয় যোজনা পর্যদ বা ভারত সরকার গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকটি কমিশন বসিয়েছিলো দারিদ্রসীমার নিচে অবস্থিত মানুষের সংখ্যা নির্ধারণের জন্য। অর্জুন সেনগুপ্ত কমিশনের মতে দারিদ্রসীমার নিচে অবস্থান করছেন জনসংখ্যার ৭৭ শতাংশ। এন সি সাক্সেনা কমিটির মতে এই সংখ্যা হচ্ছে ৫০ শতাংশ। যোজনা পর্যদ গ্রহণ করেছে তেন্ডুলকর কমিটির রিপোর্ট। আর এই রিপোর্ট অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩৭ শতাংশ মানুষ বাস করেন দারিদ্রসীমার নিচে।

বিশ্বে দারিদ্র্য মাপার নানান সূচক আছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের দারিদ্র্য সংক্রান্ত মানদণ্ড অনুযায়ী ১.২৫ ডলারের কম মাথাপিছু প্রতিদিন আয়/ব্যয় করলে ধরতে হবে তিনি দারিদ্রসীমার নিচে আছেন। দারিদ্র মাপার আর একটি মানদণ্ড হলো বিশ্ব ক্ষুধা সূচক (GHI)। এই সূচক অনুযায়ী কোনো দেশের ক্ষুধার প্রাবল্য মাপতে তিনটি বিষয়কে বিচারে নেওয়া হয়— (১) জনসংখ্যার কত অংশ প্রয়োজনীয় কিলো-ক্যালরি পাচ্ছে না; (২) পাঁচ বছরের নীচের শিশুদের মধ্যে কত অংশ প্রয়োজনীয় ওজনের চেয়ে কম ওজন বিশিষ্ট; এবং (৩) পাঁচ বছরের নীচে শিশুদের মধ্যে মৃত্যুর হার। যে দেশে এই সূচকের মান যত বেশি সে দেশে দারিদ্র্যের প্রাবল্য তত বেশি। মান যদি ৫-এর কম হয় তবে দেশটির দারিদ্র্যের প্রাবল্য কম ধরতে হবে। আর মান যদি ৫ থেকে ১০-এর মধ্যে থাকে তবে দারিদ্র মাঝারি এবং সূচকের মান ১০ থেকে ২০ হলে ধরতে হবে দেশটির অবস্থা 'সঙ্কটজনক'। আর যদি এই মান ২০ থেকে ৩০ হয় তবে দারিদ্র্যের প্রাবল্য রীতিমতো 'আশঙ্কাজনক' ধরতে হবে।

২০১১-র রিপোর্টে এই বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ভারতের মান ২৩.৭। ২০০৮-এর পর থেকে এই মান অপরিবর্তিত আছে। যার অর্থ বিশ্ব ক্ষুধা সূচক অনুযায়ী ২০০৮-১১ এই পর্বে ভারতের দারিদ্র্যের প্রাবল্যের কোন হ্রাস ঘটেনি। বিশ্বের ৮৮টি দারিদ্র কবলিত দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ৬৬, আর এই স্থান ২০০৮ থেকে অপরিবর্তিত আছে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী চীন (৫.৫), শ্রীলঙ্কা (১৪.০), পাকিস্তান (২০.৭), নেপাল (১৯.৯), এরা সবাই ভারতের ওপরে। এমনকি সাব-সাহারান আফ্রিকার দেশ কেনিয়া (১৮.৬), ক্যামেরুন (১৭.৭), কঙ্গো (১৩.২), নাইজিরিয়া (১৫.৫) ও সুদান (২১.৫) ভারতের তুলনায় ভালো অবস্থায় আছে। (বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া মানগুলি বিশ্ব ক্ষুধা সূচক অনুযায়ী দেশটির প্রাপ্ত মান)

এবার বিশ্ব ক্ষুধা সূচক অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের পরিস্থিতি কী রকম একবার দেখে নেওয়া যাক। ১৭টি রাজ্যের মধ্যে পাঞ্জাব (১৩.১), কেরালা (১৭.৭), অন্ধ্রপ্রদেশ (১৯.৫) এবং আসাম (১৯.৮), অন্তর্ভুক্ত হয়েছে "গুরুতর" বিভাগে। হরিয়ানা (২০.০) উত্তরপ্রদেশ (২০.১), তামিলনাড়ু (২১.০), রাজস্থান (২১.০), পশ্চিমবঙ্গ (২২.২), কর্নাটক (২২.৮), ওড়িশা (২৩.৭) মহারাষ্ট্র (২৩.৮), গুজরাট (২৪.৭), ছত্তিশগড় (২৬.৬), বিহার (২৭.৩) এবং ঝাড়খন্ড (২৮.৭) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে "আশঙ্কাজনক" বিভাগে। পঞ্জাবের বহুল বিজ্ঞাপিত সবুজ বিপ্লব বা অন্ধ্রের চন্দ্রবাবুর আমলের ঝাঁ চকচকে হায়দ্রাবাদ দারিদ্রকে বহাল রেখেই, বা বলা ভালো ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। সেখানে গড় সাধারণ মানুষ এখনও ভুখা পেটে ঘুমোতে যান। সিলিকন ভ্যালি হিসাবে খ্যাত বেঙ্গালুরুর ছটা বা দ্যুতি সত্ত্বেও কর্নাটকের অবস্থা সাব-সাহারান দেশ কেনিয়া-ক্যামেরুনের থেকেও খারাপ। শিল্পায়নের ধ্রুবতারা নরেন্দ্র মোদীর গুজরাট বা ৩৪ বছরের বাম-শাসিত পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা বিশ্ব ক্ষুধাসূচকের বিচারে সুদানের থেকেও পেছনে। ছত্রিশগড়, ঝাড়খন্ডের মত খনিজ-সমৃদ্ধ রাজ্যে ক্ষুধার প্রাবল্য সুদানের থেকেও খারাপ অবস্থায় রয়েছে। আর এই দুটি রাজ্যই

সরকারি বদান্যতায় কর্পোরেট লুণ্ঠনের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে গড় জিডিপি-র বিচারে এগিয়ে থাকা মানে এই নয় যে সে দেশের বা রাজ্যেব জনগণ খেয়ে-পরে সুখে-শান্তিতে বাস করবেন। উল্লেখ্য যে সাব-সাহারান দেশগুলি জিডিপি-র বিচারে পিছিয়ে থাকলেও বিশ্ব ক্ষুধা সূচকের রায় অনুযায়ী ভারতের থেকে এগিয়ে আছে।

ক্ষুধা এবং দারিদ্র্য মাপার আরও কয়েকটি মানদণ্ড আছে। যেমন অক্সফোর্ড দারিদ্র এবং মানব উন্নয়ন উদ্যোগ (OPHI) এবং রাষ্ট্রসংঘের দারিদ্র মাপার সূচক (UNDP)। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের OPHI সূচকের ভিত্তিতে মাপা দারিদ্র সম্পর্কিত গবেষকরা বলছেন, ‘‘বহুমাত্রিক দারিদ্র সূচক (Multi Dimentional Poverty Index) অনুযায়ী মানদণ্ডগুলি হল শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবনযাত্রার মান, স্কুলে কত বছর পড়েছে, পুষ্টি ও শিশু-মৃত্যু, বিদ্যুতায়ন, পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা, রান্নায় ব্যবহৃত জ্বালানি, বসতবাড়ির মেঝে ও সম্পত্তি। মানুষের মত বাঁচতে গেলে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিই (factor) এখানে মানদণ্ড হিসাবে ধরা হয়েছে। এই সূচকের নিরিখে ভারতের আটটি রাজ্যে দরিদ্রের সংখ্যা আফ্রিকার ২৬টি দেশের তুলনায় বেশি। বিহার, ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে ৪২ কোটির বেশি দরিদ্র মানুষ বাস করেন।’’

এই ক্ষুধা শুধু বর্তমান প্রজন্মকে নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও ক্ষয় করে ফেলছে। আমাদের দেশের ৫ বছরের কম বয়সের শিশুদের মধ্যে ৪৪ শতাংশ প্রয়োজনীয় ওজনের চেয়ে কম, আর এদের মধ্যে ৭ শতাংশ শিশু প্রতি বছর মারা যায়।

এই সব হাড় হিম করে দেওয়া তথ্যে ভারাক্রান্ত হয়ে পূর্বোল্লিখিত গত বার্ষিক ২৩ হাজার টাকা জিডিপি-র দিকে একটু তীর্যক চোখে তাকালে দেখা যাবে যে জিডিপি-র ২৫ শতাংশ ঢোকে হাতে গোনা কয়েকটি পরিবারের সিন্দুকে। গড় জিডিপি বাড়লেও গরিব মানুষের ক্ষুধা কমছে না, বাড়ছে। আমাদের দেশে মাথাপিছু খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ ১৯৯১ সালে ছিলো বছরে ১৭৭ কিলোগ্রাম। ১৯৯৮ সালে তা কমে হয়েছে ১৫১ কিলোগ্রাম। কম-উন্নত দেশগুলিতে (least development countries) ক্ষেত্রে এই পরিমাণ গড়ে ১৮২ কিলোগ্রাম, আফ্রিকার ক্ষেত্রে ১৯৬ কিলোগ্রাম। যোজনা পর্ষদের রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে ২০৩টি জেলায় পানীয় জলে মাত্রাতিরিক্ত ফ্লোরাইড। যার ফলে দেশের সাড়ে ৬ কোটি মানুষ ফ্লুরোসিস রোগে আক্রান্ত। ৩৫টি জেলার পানীয় জলে আর্সেনিকের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত হওয়ার কারণে ৫০ লক্ষ মানুষ আর্সেনিক দূষণের স্বীকার।

অর্থনীতিবিদ প্রণব বর্ধন সম্প্রতি বলেছেন, ‘‘দারিদ্র কমার হার ১৯৯৩-২০০৫ পর্বে মন্দীভূত হয়েছে, যে সময়ে ১৯৭০-৮০-র দশকের তুলনায় মুক্ত বাজার অর্থনীতি তীব্রতার সাথে রূপায়িত হয়েছে।’’ যোজনা কমিশনের সদস্য অভিজিৎ সেন বলছেন, ‘‘আমি নিশ্চিত যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়ছে, এবং এই লাগামছাড়া ধন-সম্পদ জমা করা রুখবার জন্য কোন কিছুই করা হয়নি’’। জনসংখ্যার খুব অল্প অংশই বিলাস-বৈভবে নিমজ্জিত। সংখ্যাগুরু অংশের অবস্থা সম্পর্কে আর বোধকরি কিছু বলার প্রয়োজন নেই। তথ্য বড় নির্মম। দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের অর্থমন্ত্রী আশা করি প্রাক-বাজেট বা বাজেট বক্তৃতায় এই কথাগুলো মনে রাখবেন, যদি না তিনি তাঁর মন, মনন বা দর্শন দালাল স্ট্রিট-ওয়াল স্ট্রিটের লগ্নি-পুঁজির রাঘব-বোয়ালদের পদপ্রান্তে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়ে না থাকেন।

এটাও সত্যি যে গত দু-দশকের বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া জনিত বিভিন্ন উদ্যোগ, যার সিংহভাগই রপ্তানি-নির্ভর, অসংগঠিত ক্ষেত্রে এক বিস্তীর্ণ কাজের বাজার তৈরি করেছে। টেক্সটাইল, লেদার, গহনা নির্মাণ শিল্প সহ অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিস্তার ঘটেছে দ্রুততায়। কিন্তু এই ক্ষেত্রগুলিতে কর্মরত শ্রমিকরা কী ধরনের মজুরি পান তা আশাকরি *অনীক*-এর পাঠকরা অবগত আছেন। সম্প্রতি গুজরাটের ভাদোদরায় আম্বানি গোষ্ঠীর টেক্সটাইল কারখানার শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন। ওই কারখানা স্থায়ী শ্রমিকরা মাসিক মজুরি পান ৬-৭ হাজার টাকা আর ঠিকা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৮৩-৮৫ টাকা। শ্রম আইন, পি-এফ, ৮ ঘণ্টার কর্মদিনের কথা না বলাই ভালো। অর্থমন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর প্রায় ৪ লক্ষ কাজ সৃষ্টি হয় সংগঠিত বেসরকারি ক্ষেত্রে। আর প্রায় ৪০ লক্ষ নতুন কর্মী কাজের বাজারে প্রবেশ করে প্রতি বছর। চাহিদা ও যোগানের এই ভয়ঙ্কর অসামঞ্জস্যই বলে দেয় মজুরির নিম্নগতির কারণ। বাস্তবে প্রতি বছর কাজের বাজারে প্রবেশ করা মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি।

আর এই পরিপ্রেক্ষিত মাথায় রেখেই প্রাক্তন বিশ্ব ব্যাঙ্ক চাকুরে প্রধানমন্ত্রী মাঝে মধ্যেই ঘোষণা করছেন দ্বিতীয় জমানার সংস্কারের কথা, শ্রম আইন সংশোধনের কথা। খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগের কথা। ডাক দিচ্ছেন দুঁপ-মনসান্টো-কার্গিল-ডাউ গোষ্ঠীগুলির মস্তিষ্ক-প্রসূত দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের।

এ সবই করা হবে সময়-সুযোগ মত। কারণ সংসদীয় গণতন্ত্রীদের মধ্যে (বাম দলগুলি সহ) এক ধরনের ঐকমত্য ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সংসদের বাইরে শ্রমজীবী মানুষের দেশব্যাপী গণসংগ্রাম অনুপস্থিত বললেই চলে। সুতরাং দারিদ্র সংক্রান্ত নির্মম পরিসংখ্যানগুলি অর্থমন্ত্রীকে পীড়া দেবে বলে মনে হয় না। অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে তিনি বিশ্বায়িত অর্থনীতির ডুবন্ত জাহাজে আমাদের দেশকে আরও শক্ত করে বাঁধার পথে আর এক ধাপ এগোবেন এমন আশঙ্কা করার কারণ আছে।

শ্যামল দাস

লেখাটি লিখতে দি স্টেটসম্যান *পত্রিকায় প্রকাশিত মানস জোয়ারদার (১৭/০২/১২) ও ভরত ঝুনঝুনওয়ালার (২৭/০২/১২) এবং* হ্যালো বস্তার *গ্রন্থে কোবাড গান্ধীর প্রবন্ধের সাহায্য নেওয়া হয়েছে*

স্মরণ

পুঁজিবাদী উন্নয়ন দেখা— কল্যাণ সান্যালের চোখে

অঞ্জন চক্রবর্তী

কল্যাণ সান্যালের বৌদ্ধিক উত্তরাধিকার নিয়ে আলোচনা করা এক দুরূহ কাজ, কেননা তাঁর চর্চা ছড়িয়ে ছিলো নানান সমস্যার এক ব্যাপক ক্ষেত্র জুড়ে। এই লেখায় আমি তার একটি মাত্র দিক নিয়ে আলোচনা করবো— গত তিন দশক ধরে তিনি যে বিষয়টিতে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন— পুঁজিবাদী উন্নয়ন নিয়ে নতুন করে ভাবনা, যা শেষ পর্যন্ত 'পুঁজিবাদী উন্নয়ন নিয়ে নতুন করে ভাবনা' (*Rethinking Capitalist Development*) নামক উচ্চ-প্রশংসিত পুস্তকে তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই বইটির নানা দিক নিয়ে অনেকেই ইতিমধ্যে অনেক কিছুই লিখেছেন। কল্যাণ যে সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করেছেন, এখানে আমি সেই সমস্যার উৎস নিয়ে কিছু কথা লিখবো। আমি মনে করি কোনো কাজকেই তার প্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। যে সমস্যাটি আলোচিত হতে যাচ্ছে তার চরিত্র সম্পর্কে কিছুই না বলে সমস্যাটি সম্পর্কে আলোকপাতও করা যায় না। আশা রাখি এই আলোচনার মধ্য দিয়ে কল্যাণ যে বিষয়গুলির ওপর জোর দিতে চেয়েছিলেন সেগুলির বিষয়ে কিছু আলোকপাত সম্ভব হবে।

কল্যাণ-এর চিন্তায় পুঁজিবাদী উন্নয়ন ধারণার সমস্যাটির উৎস হিসেবে দেখতে হবে মার্কসবাদ চর্চায় সাধারণভাবে বা বিশেষভাবে ভারতীয় মার্কসবাদে রূপান্তর সংক্রান্ত প্রতর্কটিকে— যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে ১৯৬০-৭০ এর উৎপাদনের পদ্ধতি সংক্রান্ত বিতর্কের মধ্যে দিয়ে। এই বিতর্কের পশ্চাৎভূমিতে ছিলো এই ধারণা যে ঐতিহাসিকভাবে পুঁজিবাদের প্রকাশ দুটি বিকল্প রাস্তা অনুসরণ করতে পারে। একটি রাস্তা হলো, পুঁজিবাদ তার ধ্রুপদী পথ অনুসরণ করে প্রাক্-পুঁজিবাদী পুঁজিকে হত্যা করবে (আদিম পুঞ্জীভবনের মাধ্যমে) অথবা সে ধ্রুপদী পথ ছেড়ে দিয়ে প্রাক্-পুঁজিকে আত্মসাৎ করে এক খিচুড়ি ব্যবস্থা নির্মাণ করবে যেখান থেকে পুঁজির আধিপত্য তৈরি হবে। দ্বিতীয়টি ঘটে যখন প্রাক্-পুঁজিকে হত্যা করার জন্য পুঁজি যথেষ্ট শক্তিশালী থাকে না।

প্রথম বা ধ্রুপদী পথটি পশ্চিমী দেশগুলো (এবং এমনকি চীনও) গ্রহণ করেছে। ধ্রুপদী মার্কসবাদে উৎপাদন পদ্ধতি বিচার করে সমাজ-বিবর্তনের যে মূল মানচিত্র অনুসরণ ক'রে সাম্যবাদে উপনীত হওয়ার কথা বলা হয়েছে— সেখানে সমাজ সাম্যবাদ থেকে কতটা দূরে বা কাছে রয়েছে তা বিচার করা হয় সরলরৈখিকভাবে। যেমন, পশ্চাৎপদ সামন্তী সমাজ অবশ্যই পূর্ব-নির্ধারিতভাবে অগ্রগামী সমাজ, যেমন পুঁজিবাদকে, স্থান ছেড়ে দেবে। এটিই বিতর্কে প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। বিতর্ক বেধে উঠেছে— ভারতীয় সমাজের উৎপাদন পদ্ধতি পুঁজিবাদী নাকি সামন্ততান্ত্রিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-ঔপনিবেশিক ইত্যাদি এবং এই বিষয়টির ওপর ভিত্তি করেই সমাজ পরিবর্তনের মানচিত্র নির্মাণ করতে হবে। বর্তমানে ভারতের কোনও কমিউনিস্ট পার্টির সমাজ পরিবর্তনের মানচিত্রে এমন সরল-রৈখিক প্রকল্প নেই, কিন্তু তাদের পথটিও উৎপাদন পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করেই গঠিত। এ বিষয়ে আলোচনা জরুরি, কেননা কল্যাণ সান্যালের বৌদ্ধিক যাত্রাপথ ধ্রুপদী উৎপাদন পদ্ধতি-ভিত্তিক কাঠামো বা তার বিপরীত কাঠামো থেকে মৌলিক ভাবে ভিন্ন।

অ্যান্তোনিও গ্রামশ্চি প্রস্তাবিত পুঁজির নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের অ-ধ্রুপদী যে পথ রয়েছে তাকে কল্যাণ সান্যাল সহ অনেকেই বিকল্প হিসেবে ধরে নিয়েছেন (কল্যাণ সান্যালের ১৯৯১-৯২ বা ১৯৯৩-এর লেখা দেখা যেতে পারে। তাঁর 'পুঁজিবাদী উন্নয়ন নিয়ে নতুন করে ভাবনা' বইতে যা রয়েছে, এ গুলিকে তার পূর্ব ভাবনা হিসেবে ধরা যেতে পারে।) পুঁজির এই নিষ্ক্রিয় বিপ্লব একটি জটিল আধিপত্যর ধারণা সম্পর্কে আমাদের পরিচিত করে, যা এক কৃত্রিম পুঁজি এবং প্রাক্-পুঁজির মধ্যে সংশ্লেষ ঘটায়। এই সংশ্লেষের মাধ্যমে পুঁজির আধিপত্য নিশ্চিত হয়। কল্যাণ যুক্তি দিয়েছেন:

> ...আমরা প্রাক্-পুঁজির সাপেক্ষে পুঁজির ক্ষমতার প্রশ্নে একটি বিভাজিকা টানতে পারি। যে সরাসরি আক্রমণ আদিম পুঞ্জীভবনের বৈশিষ্ট্য, তার বদলে এখন পুঁজির নিজস্ব পরিসরে প্রাক্-পুঁজিকে একটি ভিন্ন উপাদান হিসেবে স্থান দেওয়া হয়। খতম করার পরিবর্তে তাকে এই ব্যবস্থায় একটি স্থান দেওয়াই হলো। যেহেতু পুঞ্জীভবনই আর বিকাশের একমাত্র দিক হতে পারে না, পুঁজির কার্যক্রমও এমনভাবে সংশোধিত করা হয় যাতে করে তা প্রাক্-পুঁজির প্রয়োজনের দিকেও নজর দিতে পারে। অন্যভাবে বলা যায়, পুঁজির যে মতাদর্শকে সামনে আনা হয় তাতে এখন প্রাক্-পুঁজির অস্তিত্ব, তার নিজস্ব লক্ষ্য এবং চাহিদাকে মেনে নেওয়া হয়। (সান্যাল, ১৯৯৩, পৃ. ১২১)।

এক্ষেত্রে তিনটি বিষয় খেয়াল করার মতো। প্রথমত, প্রাক্-পুঁজিবাদকে হত্যা করার পরিবর্তে তাকে আত্মস্থ করাকে পুঁজিবাদের পরাজয় না বলে তাকে পুঁজির বিজয় বলা যায়— কথাটা যতই হেঁয়ালির মতো শোনাক না কেন! যে অবস্থায় পুঁজি, প্রাক্-পুঁজির বিভিন্ন উপাদানের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণে অপারগ, যেখানে আদিম পুঞ্জীভবনের মাধ্যমে এই আক্রমণ অসম্ভব সেখানে এই ঘটনা ঘটতে পারে। হেগেলিয় দ্বন্দ্বতত্ত্বে যেখানে প্রকল্প-প্রতি-প্রকল্প থেকে সংশ্লেষ (thesis-antitheses-synthesis) ঘটার যে প্রক্রিয়ার কথা রয়েছে, তা এক্ষেত্রে স্তব্ধ

বিকল্প অর্থনীতি নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক কল্যাণ সান্যাল অন্যতম। অল্প কিছুদিন রোগভোগের পর গত ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০১২ তিনি প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অনীক-এর পক্ষ থেকে এই নিবন্ধটি প্রকাশ করা হলো।

হয়ে যায়। বদলে সেই অবস্থার কৃত্রিম গর্ভে এক সংশ্লেষের জন্ম হয় যেখানে পুঁজিবাদ তার নিয়ম হিসেবে প্রাক্-পুঁজিকে আত্মস্থ করে। আমি আগে যেমন বলেছি, এই সূত্রটি হলো পুঁজি ও প্রাক্-পুঁজির উপস্থিতিতে পুঁজির একাধিপত্য নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়ত, ধ্রুপদী মার্কসবাদী তত্ত্বে রাষ্ট্রের ভূমিকা হিসেবে বলা আছে, তার থেকে এই প্রকল্প মৌলিকভাবে ভিন্ন— কেননা প্রথম বিষয় হিসেবে আমরা এতক্ষণ যা বললাম, ধ্রুপদী ধারণা মতে পুঁজিবাদী উন্নয়ন পরিচালনায় রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তা ব্যর্থতার সূচক। এর বদলে যেহেতু পুঁজি এবং প্রাক্-পুঁজি সহাবস্থান করছে, এখন পুঁজির একাধিপত্যর জন্য একটি নিরপেক্ষ সংস্থার প্রয়োজন যা কিনা পুঁজি-প্রাক্-পুঁজির ঊর্ধ্বে বিচরণ করবে। এটি হবে এক ধরণের কৃত্রিম সংশ্লেষ, যা আজকের ভারতীয় রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে। তাই রাষ্ট্র ব্যর্থ, একথা বলার পরিবর্তে রাষ্ট্রকে বুঝতে হবে পুঁজিবাদী সূত্রের এক আবশ্যিক উপাদান হিসেবে, যার মাধ্যমে এক জটিল আধিপত্যর নির্মাণে পুঁজির চূড়ান্ত একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সবশেষে, উৎপাদন পদ্ধতির এই তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে এক ধরণের অর্থনীতিবাদ রয়েছে; এখানে ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তনের চেয়ে অর্থনৈতিক পরিবর্তনই মৌলিক। অন্য প্রকল্পটিতে এই জটিল একাধিপত্যই অর্থনীতির পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষমতার মৌলিকত্বর কথা বলে।

এই তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে কল্যাণের *পুঁজিবাদী উন্নয়ন সম্পর্কে নতুন ভাবনা* পুস্তকের যাত্রা শুরু। এখানে কল্যাণ প্রথম বিন্দুটি থেকে অনেকটা সরে এসেছেন, কিন্তু পরের দুটি বিন্দু ধরে রেখেছেন। মনে রাখতে হবে পুঁজি-প্রাক্-পুঁজির জটিলতায় এখনও ঐতিহাসিক অনিবার্যতা এসে পড়ে। রূপান্তরের যুক্তি হিসেবে যেমন বলা হয় যে সমাজের অর্থনীতি প্রথমে পুঁজিবাদ থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্ব-নির্ধারিত সাম্যবাদের পথে পাড়ি দেয়। ব্যবস্থার গর্ভে কৃত্রিম সংশ্লেষ হলো হেগেলের দ্বন্দ্ব-তত্ত্বর ক্ষেত্রে উন্নতিমূলক সংযোজন। কিন্তু পুঁজির আগে 'প্রাক্' কথাটি বসানো এখনও একধরনের অনগ্রসরতার ছাপ লাগায়। এর ফলে প্রাক্-পুঁজিবাদ এক ধরনের বহির্স্থ, বহির্ভূত সত্তা হিসেবে হাজির হয়, যা ইতিহাস-নির্দিষ্টভাবেই পুঁজিবাদ-পূর্ব। এর ফলে প্রাক্-পুঁজিবাদকে আত্মস্থ করে তাকে পুঁজিবাদের সূত্রের মধ্যে স্থান দিয়ে পুঁজিবাদের উদ্দেশে যাত্রা করার সমস্যা রয়েই যায়। পুঁজির নিষ্ক্রিয় বিপ্লব এবং ব্যবস্থার গর্ভে জন্ম নেওয়া কৃত্রিম সংশ্লেষের সমস্ত ব্যঞ্জনা মেনে নিলেও সমাজ রূপান্তরের মধ্যে ঐতিহাসিক অনিবার্যতার সমস্যাটি রয়েই যায়। কল্যাণ এই পথ ত্যাগ করে পুঁজিবাদের আগে বসানো 'প্রাক্' কথাটির পরিবর্তে 'অ-পুঁজিবাদী' শব্দটি প্রয়োগ করেন। এই প্রয়োগের ফলে আমাদের তিনি পুঁজিবাদের মধ্যেকার এবং পুঁজিবাদ এবং অ-পুঁজিবাদের ভেতরকার বিভেদের সম্মুখীন করে দেন। এভাবে তিনি ঐতিহাসিক অনিবার্যতাকেও বর্জন করতে সক্ষম হন। পুঁজি এবং অন্যান্য 'অ-পুঁজি' এখন পণ্য সম্পর্ক দ্বারা সংযুক্ত হয়ে উত্তর-ঔপনিবেশিক অর্থনীতি গড়লো, যাকে কল্যাণ পুঁজিবাদ আখ্যা দিলেন।

পুঁজিবাদী উন্নয়ন এমন একটি প্রক্রিয়া হয়ে ওঠে যা অ-পুঁজিবাদী প্রক্রিয়া *নির্মাণ* করে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাকে সহায়তা করে। এই পুঁজিবাদী উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় অ-পুঁজির সৃষ্টি, বিনাশ এবং নতুন করে সৃষ্টি ঘটে চলে। অ-পুঁজির বিনাশকারী আদিম পুঞ্জীভবন প্রক্রিয়া এখন চলতে পারে; পাশাপাশি রাষ্ট্র তার প্রয়োজন অনুসারে যে অ-পুঁজির পুনঃসৃষ্টি করছে, তা দিয়ে এই পুঞ্জীভবন প্রক্রিয়া নিষ্ক্রিয়ও হয়ে যেতে পারে। এর দ্বারা পুঞ্জীভবনের নেতিবাচক দিকটি প্রয়োজন-ভিত্তিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ইতিবাচক উপাদান দ্বারা আটকানো যাবে। এই পুঁজিবাদী উন্নয়ন অ-পুঁজির জন্য একই সঙ্গে ধ্বংস এবং নির্মাণ। এর ফলে পুঁজি-অপুঁজি-র দ্বারা নির্মিত যে জটিল উপাদানটি গঠিত হলো তা গতিশীল হয়ে পড়ে। যে বিষয়টি এখানে বিশেষভাবে খেয়াল করার তা হলো অ-পুঁজিবাদ এখন আর পুঁজিবাদী উৎপাদনের বাইরের কোনও উপাদান নয়—তা এখন পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় অর্ন্তলীন এবং সংযুক্ত হয়ে গেছে। পুঁজির প্রয়োজন অ-পুঁজির আর তাই পুঁজি একে উৎপাদন করে নেয়। অ-পুঁজির সৃষ্টি-বিনাশ এবং পুনঃসৃষ্টির জন্য ক্ষমতার এক নতুন ধারণার প্রয়োজন, যার জন্য কল্যাণ ফুকোর মূলত শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত সহমত নির্মাণ ও ক্ষমতার ধারণা ব্যবহার করেছেন। গ্রামশ্চির পুঁজির নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের ধারণাকে নতুনভাবে আনার জন্যই ফুকোর ধারণা ব্যবহার করে কল্যাণ পুঁজি-অপুঁজি এই জটিল উপাদানের মাধ্যমে কী ভাবে পুঁজির রাজনৈতিক শাসন নিশ্চিত হতে পারে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আর সব শেষে কল্যাণের প্রস্তাবনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, একই সঙ্গে সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয়টি হলো যাকে আমরা বলতে পারি 'ইতিহাসের সমাপ্তি'। এই পরিসমাপ্তির কথা আসছে কেননা কল্যাণের প্রস্তাবনামতে সমাজ পরিবর্তনের মার্ক্সীয় ধারণার উৎক্রান্তির সমস্যাটিকে আর প্রশ্ন হিসেবে বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন যে, ''ঐতিহাসিক বিচারে রূপান্তর ইতিমধ্যে ঘটে গেছে'' (সান্যাল, ২০০৭, পৃ-৪০) এবং 'এই প্রস্তাব মতে পুঁজিবাদী উন্নয়ন মানে অ-পুঁজি থেকে পুঁজিতে পর্যবসিত হওয়ার কোনও গঠনমূলক পরিবর্তন নয়, বরং তা হলো পুঁজি-অপুঁজি এই জটিল উপাদানটির বিকাশ' (ঐ)। রাজনীতিকেও এই জটিল উপাদানের মধ্যেই পরিবর্তিত হতে হবে এবং এর থেকে উদ্ভূত নানান ব্যঞ্জনাকে উপলব্ধি করতে হবে। (*ভাষান্তর আমাদের*)

সূত্র:

- Sanyal, K. K , 1988 : 'Accumulation, Poverty and State in the Third World Capital/Pre-Capital Complex', *Economic & Political Weekly*, 23 (5)
- Sanyal, K. K., 1991-1992 : 'Of Revolutions, Classic & Passive', *Society and Change*, 8 (3 & 4)
- Sanyal, K. K. 1993 : 'Capital, Primitive Accumulation, and the Third World, *Rethinking Marxism 3* (Fall).
- Sanyal, K.K. 2007 : *Rethinking Capitalist Development : Primitive Accumulation, Governmentality and Post-Colonial Capitalism.* Routledge.

সংবাদমাধ্যমের দায় : ঝুলির বেড়ালটা সামলে

মালবিকা মিত্র

এভাবে একা এত দায়িত্ব সামলানো যায়? জন্ম লগ্ন থেকেই যত দায় যেন সংবাদমাধ্যমের! কিছু মানুষ দেশকে এগিয়ে দিতে চাইছে, তখন নিন্দুকেরা দেশকে পিছে টানে। এগোতে দেয় না। বলে 'পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে'। এই পিছুটান কাটিয়ে দেশকে সামনে এগিয়ে দিতে হাজির সংবাদমাধ্যম 'পড়তে হয়, নইলে পিছিয়ে পড়তে হয়'... 'এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে'। উন্নয়নের সদা-সতর্ক সোচ্চার প্রহরী। আপনাদের দেখিয়েছি চিত্র সহ হরিয়ানার তথ্য, সেখানে চাষির কত সুখ। প্রথম পাতায় তাক্ লাগনো ছবি... তথ্যপ্রমাণ। হরিয়ানার চাষি চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে সরাসরি কোম্পানির সাথে। কী ফলাবে... দাম কত... কী বীজ... কী সার... সব ঝুঁকি কোম্পানির; এমনকি সব মাল কিনবে কোম্পানি। চিন্তামণির নো চিন্তা... শুধুই মানি। একথাটা ওই মোটা মাথায় ঢোকায় কার সাধ্যি!

এই অসাধ্য সাধনের দায় আমাদের... 'পড়তে হয় না হলে পিছিয়ে পড়তে হয়'। পূর্ব খিলকাপুর পঞ্চায়েত, 'মেট্রো ক্যাশ এন্ড ক্যারি' সরকারি চাষির কাছে... চাষীর জীবনে এখন 'পরিবর্তনের' হাওয়া। সংস্থা গ্রামে এসে ফসল কিনছে... ভালো ফলনের পরামর্শ দিচ্ছে। বছর ত্রিশ বয়সী আজিজুল, এক বিঘেতে পালং ফলিয়েছে ৫০ মন, খরচ হয়েছে ৪ হাজার টাকা। কোম্পানিকে বিক্রি করেছে ১৬ হাজার টাকায়। ওদিকে মুজিবর ঘরামি ফড়ের কাছে পালং বিক্রি করে একটাকা লোকসানে, প্রতি কেজি আড়াই টাকা। অথচ শহর ও শহরতলীর বাজারে পালং বিক্রি হয় ৬ থেকে ১০ টাকা কেজি। লাভের গুড় খাচ্ছে পিঁপড়ে। মেট্রো ক্যাশ এন্ড ক্যারি— কৃষকের পাশে, কৃষকের বন্ধু।

লোকসভায় যেদিন খুচরো ব্যবসায় বিদেশি লগ্নি স্থগিত রাখা হলো, সেইদিন সকালে আজিজুল 'মেট্রো ক্যাশ এন্ড ক্যারি'-কে ৫০টি ফুলকপি বেচলেন, প্রতি কপি আড়াই টাকা দামে। লাভ কপি-প্রতি একটাকার বেশি। ঐদিনেই মিরাজুল মোল্লা ফড়েদের কাছে ফুলকপি বেচেছেন ৭৫ পয়সা দরে; প্রতি কপিতে খরচ পড়েছিল দু'টাকা। হতচ্ছাড়া ফড়ের দল দূর হটো... বিদেশি পুঁজি স্বাগতম সুস্বাগতম। কোম্পানির দৌলতে আজিজুল লাভের কড়ি গোনে। আর ফড়েদের দৌলতে মুজিবর-মিরাজুল প্রমাদ গোনে। ...উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে অরুণাভ ভট্টাচার্য ও শুভাশিস ঘটকের রিপোর্ট। 'পড়তে হয় না হলে পিছিয়ে পড়তে হয়'... 'এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে'।

সংবাদমাধ্যমের দায় তো এই প্রথম দেখছেন না। এই তো সাম্প্রতিক অতীতে ২০০৬ সালের অক্টোবর মাস। নিন্দুকেরা ছাপালো সিঙ্গুরে পুলিশি পীড়নের কাহিনী... চাষির জমি হারানোর কাহিনী। আমরা লিখলাম সিঙ্গুরে কর্মসংস্থানের খতিয়ান। প্রথম পাতায় ছবি ছাপলাম... শালের খুঁটি কাঁধে দিনমজুর চলেছে... প্রথমেই চারশো মানুষের কর্মসংস্থান। ছবি ছাপলাম, সিঙ্গুরে শান্তি সেরামিকসের বারান্দায় চলছে পরীক্ষা গ্রহণ... কি, মনে পড়ছে তো? কী করা যাবে, আমাদের একার দায়! পড়তে হয়, না হলে পিছিয়ে পড়তে হয়। ভাবুন, ১০ হাজার কোটি লগ্নি... এক হাজার একর জমি... তাতো লাগবেই... শিল্প তো আকাশে হবে না! একথা বোঝাবে কে? কাকেই বা বোঝাবে? অগত্যা আমরাই...। এগিয়ে থাকি এগিয়ে রাখি।

একাজে ত্যাগ স্বীকার করতে হয় বিস্তর। মানুষ ভুল বুঝলো। মানুষ আমার পত্রিকা বর্জন করলো... চ্যানেল বর্জন করলো। পশ্চাদপদের দল... পিছিয়ে পড়তেই আগ্রহী। অগত্যা, সাময়িক রণে ভঙ্গ। কদিন তালে তাল মিলিয়ে চলা। জল শুকালে কলমী পাতাকে কাদা মাটি পাঁক খুঁজতেই হয়। তারপর বর্ষা এলে ফাল দিয়ে ওঠার পালা। আজ যখনই খুচরো পণ্যের বাজারে বিদেশি বিনিয়োগ প্রশ্ন এসেছে... ফাল দেবার সময় এসেছে। কারণ আমরা 'এগিয়ে থাকি, এগিয়ে রাখি'। একবার না পারিলে দেখ শতবার। উন্নয়নের লক্ষ্যে অবিচল।

আরও আগে উনিশ শতকে সংবাদপত্রের সূচনা লগ্নে, মনে করে দেখুন, সবেমাত্র মহামান্য ইংরাজ প্রভুর কৃপা প্রদর্শন... হাওড়া থেকে বর্ধমান হয়ে রানীগঞ্জ ১২১ মাইল রেলপথ নির্মাণ শুরু হল। ১৮৫১ সালে। ১৮৮০-র ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়নে 'Railway extension in Bengal'-এ কত বিবরণ... কত হিসেবপত্র। কত না উচ্ছ্বাস! উন্নয়নের সংকেত। ১৮৭২ সালে এডুকেশন গেজেটে লেখা হল 'বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশের সুহৃদয়বর্গের বহুতর উপকার সাধিত হইয়াছে'। উপকার বহুপ্রকার... দূরবর্তী অঞ্চলে যোগাযোগ ও সম্বন্ধ স্থাপন... পণ্য পরিবহনে ব্যয় কম... পণ্য চলাচল সহজ... কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারণ... মূল্যমানে সমতা... উপকার আর উপকার! ভাবুন, পান্ডুয়ার কৃষক, মেমারির কৃষক আর যে কোনো দামে আঞ্চলিক বাজারে মাল বিক্রি করে না। পান্ডুয়ার পণ্য বাজার সম্প্রসারণের ফলে শ্রীরামপুর চন্দননগর উত্তরপাড়ার বাজারে পাড়ি জমাল। বেশি দাম পাওয়া গেল। এসবই তো আধুনিক রেলপথের অবদান, উন্নয়নের সুফল। সাধে কী বলেছি... পড়তে হয়, না হলে পিছিয়ে পড়তে হয়।

গণতন্ত্র হলো সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত গ্রহণ। মতামতগুলো সাদা-কালো, হ্যাঁ-না, ভালো-মন্দ এভাবে থাকে না। কতরকম মাত্রায় কতরকম শেড থাকে। সেগুলো গুছিয়ে সাইড করা... একরকম করা... তখন সেটা বলে জনমত। গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত জনমত। এই জনমত নিজে থেকে গড়ে

ওঠে না... সংগঠিত করতে হয়। এই সংগঠিত করার অন্যতম দাবিদার সংবাদমাধ্যম। ধরুন, আপনি খুচরো পণ্য বিক্রয়ে বিদেশি বিনিয়োগ প্রশ্নে সংশয়ী... তবে বিরোধী নন। সংবাদমাধ্যমে সাত সকালে চায়ের সাথে বলবে হরিয়ানার চাষির কত সুখ... উত্তর চব্বিশ পরগণায় 'মেট্রো ক্যাশ এন্ড ক্যারি'-র সৌজন্যে চাষি লাভের টাকা গোনে... দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার চাষি 'ফড়েদের' সৌজন্যে প্রমাণ গোনে। তারপর অফিস যাওয়ার পথে ট্রেনে বাসে সেই সংবাদের চর্বিতচর্বণ চলবে পণ্ডিতি চালে। বক্তা ও শ্রোতার পাণ্ডিত্য সংবাদমাধ্যমের সীমায় আবদ্ধ। অফিসের টেবিলেও রেশ চলবে। সন্ধ্যায় টিভি চ্যানেল... এপক্ষ ওপক্ষ প্রতিপক্ষ... চলবে জনমত সংগঠন। আপনার সিদ্ধান্তগ্রহণের কাজটা সহজ করার জন্য সংবাদ মাধ্যমের এই প্রয়াস। এভাবে চলতে পারলে কিছুদিন পর কষ্ট করে আপনাকে তথ্যবিচার-সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে হয় না। সংবাদমাধ্যমই সিদ্ধান্ত করে দেয়। ফাস্ট ফুড... রেডিমেড সিদ্ধান্ত। দায়-দায়িত্বটা অনুমান করুন! সাধে কি রাজনীতির কারবারিরা সংবাদমাধ্যমকে এত তৈলমর্দন করে! জনমত!

স্রেফ বিভ্রান্ত করা। সেই শিশুপাঠ্যে পড়েছিলাম— মোরগ ছানার মা কাজে যায়, ছানাদের সাবধান করে 'ভুলেও বাইরে বেরিও না'। ক্ষুধার্ত ছানাদের প্রতীক্ষা... মা খাবার আনবে। সেই সময় শেয়াল গান ধরে— 'ছেলেরা সব করছে খেলা/ছড়িয়ে দিচ্ছে গমের দানা/মুরগিরা সব খুঁটে খেল/পায়না কিছু মোরগগুলো।' এই গান শুনে মোরগছানা যেই না বাইরে এলো... অমনি শেয়াল...। হুঁ! জনমত! এ হলো প্রবঞ্চনা। শেয়ালের এই গান অনেকটা উত্তরের 'টাকা গোনা' আর দক্ষিণের 'প্রমাণ গোনা'-র সাথে সুরে মিলে যাচ্ছে। জনমতের কথা যখন এল তাহলে আর এক শেয়ালের গল্প বলি— উনিশ শতকের সূচনায় হিন্দু মধ্যবিত্ত পশ্চিমী শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করে ও শীঘ্রই শাসকের নির্ভরযোগ্য মিত্র হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্য শিক্ষা... হীরক রাজার যন্তরমন্তর ঘর... মগজ ধোলাইয়ের ব্যবস্থা। কিন্তু মুসলমান মধ্যবিত্তরা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করেনি। ব্রিটিশ শাসনেই ইসলামের গৌরবময় শাসনের অবসান হয়, একথা মুসলমান সম্প্রদায় ভুলতে পারেনি। তাই তারা বৃটিশ শাসনকে মানতে পারে নি... বর্জন করে চলেছিল। এই সময় শেয়াল গান ধরলো, 'হিন্দুরা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করে সমস্ত চাকরি সরকারি পদ হস্তগত করলো। আর মুসলমানরা পাশ্চাত্য শিক্ষা বর্জন করে আত্মবঞ্চনা করছে। একটি বঞ্চিত সম্প্রদায়! আহা!'

বেশ তো মেনে নিলাম আপত্তি। রেলপথ পাণ্ডুয়া মেমারির কৃষকের কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারণ করলো। বেশ কথা। এখন কৃষিপণ্য আঞ্চলিক বাজারের জন্য উৎপাদন হয় না। দূরবর্তী বাজারে লাভজনক দরে বিক্রি হয়। কৃষিপণ্য ভালো দাম পায়, অতএব রেল সংলগ্ন কৃষিজমির দাম বাড়লো, বাড়লো জমির খাজনা। ঠিক কথা। কিন্তু বাস্তবে পাণ্ডুয়া মেমারির কৃষি পণ্য শহরে আনলো একদল ফড়ে-দাঁওবাজ-পাইকার। কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও বর্ধিত মূল্যের সুযোগটা কৃষকের কাজে লাগল না... অথচ কৃষক গুনলো বর্ধিত খাজনার চাপ। কৃষক দরিদ্রতর হলো। এগিয়ে থাকা এগিয়ে রাখার দল সেদিন কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারণের কথা বলে ফড়ের স্বার্থে ওকালতি করেছে... গ্রাম থেকে শহরে খাদ্যের প্রবাহ সৃষ্ট করেছে... গ্রাম খাদ্যহীন হয়েছে। আজ ফড়ের পীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার, একচেটিয়া পুঁজির সেবায় নিযুক্ত। যখন যেমন প্রয়োজন... মুরগি নয়তো কী?

বেশি লাভের আশায় ফড়ের দল গ্রাম থেকে শহরে খাদ্য উজাড় করে পাঠায়। কৃষকের পারিবারিক খাদ্যভাণ্ডার শূন্য হয়। রজনীপাম দত্ত লেখেন, রেলপথ স্থাপনের আগের পঞ্চাশ বছরে দেশে সাতটি দুর্ভিক্ষে মারা যায় ১০ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষ। রেলপথ স্থাপনের পর, অর্থাৎ কৃষি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে ছাব্বিশটি দুর্ভিক্ষ... মৃতের সংখ্যা ২ কোটি ৮০ লক্ষ ৫০ হাজার! এরপরও কি মুরগি শব্দে আপত্তি? আর ধরে বেঁধে মুরগি বানানোর নাম হলো জনমত গঠন... এগিয়ে রাখে, এগিয়ে থাকে।

ভেড়ার চামড়া গায়ে জড়ানো নেকড়ের দল আমাদের অচেনা নয়। গবেষক সুশীল চৌধুরী দেখিয়েছেন— এদেশের পণ্য বাণিজ্যে ব্রিটিশ কোম্পানির একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা ছিল প্রধান লক্ষ্য। অন্যদের বাজার থেকে হটিয়ে দেওয়ার লক্ষ্য। তাই প্রয়োজন উৎপাদকের সাথে কোম্পানির সরাসরি সংযোগ স্থাপন। তারপর বাজার নিয়ন্ত্রণ। একাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন ছিল পলাশী যুদ্ধ... রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল। রমেশ চন্দ্র দত্ত পলাশী যুদ্ধের পর কোম্পানির কর্মপদ্ধতি বর্ণনা করেছেন— কোম্পানির নির্ধারিত দামে, কোম্পানির চাহিদা মতো উৎপাদক কারিগরের সাথে চুক্তি হতো। লাভজনক দাম পেলেও ফরাসী ডাচ আর্মেনিয়ান ইত্যাদি বণিকের মাল তৈরি করা যেতো না। কারিগর উৎপাদক স্বভাবতই অলাভজনক চুক্তি কবুল করতো না। তখন কোম্পানি ঐ কারিগরের বাড়িতে পেয়াদা নিয়োগ করতো। কারিগরকে নানাভাবে হয়রান করতো। তারপর যখন কবুল করতে বাধ্য হতো তখন পেয়াদার খরচও চাপানো হতো, কারিগরের উপর। এককথায় তারা চুক্তি করতে বাধ্য হতো। এই সমগ্র কাজটা সম্পন্ন করতো কোম্পানির দালাল-গোমস্তারা। পণ্য উৎপাদনের এই রীতি কৃষি উৎপাদনেও চালু হয়। বারাসাতের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে ঘোষণা করতে হয়েছিল "...ryots are free to grow whatever crops they like '... এই ঘোষণার পর নীলচাষি জানলো তারা মুক্ত চাষি... bonded নয়। মুরগি বনতে চাইতেই পারেন। কিন্তু একটু ইতিহাস দেখুন, ঢাকা-পাত্রসায়র-খড়ার-সিউড়ি-চন্দ্রকোনা কোম্পানির পীড়নে জনশূন্য হয়ে যায়। ইতিহাস গবেষকরা এই

এর পর ৪০ পৃষ্ঠায়

এখন পশ্চিমবঙ্গ

তপ্ত তাওয়া কিংবা ফুটন্ত তেলের কড়াই

সন্দীপ

এ কোন সকাল— রাতের চেয়েও অন্ধকার...

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার মসনদে দীর্ঘ ৩৪ বছর পর পরিবর্তন। বামফ্রন্টের জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেস জোট সরকার। সিপিআই(এম) শাসিত সরকারের গণতন্ত্রহরণকারী, শ্বাসরোধী, প্রায়-স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে তিতিবিরক্ত মানুষ ক্ষোভ উগরে দিয়েছে। ফলশ্রুতি— শাসক দলের পরিবর্তন। নতুন সরকার মাত্র ন মাস ক্ষমতায়। কিন্তু গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক প্রবণতাগুলি ইতিমধ্যেই স্পষ্ট। সরকারের সামগ্রিক পর্যালোচনা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বরঞ্চ, সরকার তথা তৃণমূল দলের অতি সাম্প্রতিক কয়েকটি পদক্ষেপ এবং মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের বেশ কিছু বক্তব্য ও মন্তব্য— জনমানসে যা প্রশ্ন ও আশঙ্কার সঞ্চার করেছে— তেমন কয়েকটি নমুনা থেকে 'সকাল দেখে দিনটা চেনার' চেষ্টা বলা যায় এই নিবন্ধকে।

প্রশাসন : কুশাসন -সুশাসন

''পরিবর্তনের বাংলায় তৃণমূলের অঙ্গীকার : সুশাসন। দলতন্ত্র নয়, গণতন্ত্র''— তৃণমূলের সাপ্তাহিক পত্রিকা *জাগো বাংলা*, ২৫-৩১ মার্চ ২০১১ সংখ্যায় এটাই ছিল প্রথম পৃষ্ঠার হেডলাইন।

প্রসঙ্গত, এই সংখ্যাতেই ছাপা হয়েছিলো তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তাহার।

সুষ্ঠু প্রশাসনের অন্যতম শর্ত— গণতন্ত্র। মূলত, গণতন্ত্র বিরোধী অবস্থান ও অনুশীলনের ফলে বামফ্রন্ট সরকার জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আর কোনো বিকল্প না পেয়ে মানুষ তৃণমূল দল, বা বলা ভালো মমতা ব্যানার্জীর পক্ষে ভোট দেয়। সিপিএম-এর জায়গা নিল তৃণমূল। মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করা এবং বামফ্রন্টের 'অপশাসন'-এর অবসান যে ঘটেছে তা প্রমাণ করার দায়, তাই, এই দলের উপর, নির্দিষ্টভাবে বললে মমতা ব্যানার্জীর উপর বর্তায়। এবং এক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি (বা কথা)-র সাথে কাজের মিল বা ফারাকের তুলনা আসাটাই স্বাভাবিক।

''আমরা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অটুট রাখব। পুলিশ প্রশাসনকে রাখবো নিরপেক্ষ। মুক্ত স্বাধীন গণতান্ত্রিক পরিবেশে ঝলমল করবে বাংলার আকাশ।... প্রতিটি পেশার মানুষ তাঁর জীবিকার লড়াইতে বন্ধু হিসাবে পাশে পাবেন মা-মাটি-মানুষের সরকারকে।... সরকারি কর্মীদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে। তাঁদের দীর্ঘদিন যে সব বক্তব্য উপেক্ষিত ছিল, যে সব বঞ্চনা দীর্ঘদিন তাঁরা সহ্য করেছেন, গোটা বিষয়টি যথাযথ ভাবে বিবেচনার মাধ্যমে আশু পদক্ষেপ নেওয়া হবে।... গণতান্ত্রিক পরিবেশ এবং মানবাধিকারকে যথাযথ গুরুত্ব এবং প্রাধান্য দেওয়া হবে''। (মমতা ব্যানার্জী, সভানেত্রী, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস, নির্বাচনী ইস্তাহার ২০১১)। এই প্রতিশ্রুতি, বলা বাহুল্য, আকর্ষণীয়। এর সাথে 'দলতন্ত্র নয়, গণতন্ত্র। বদলা নয়, বদলা চাই''— এই শ্লোগানে মানুষ ভরসা পেতে চেয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে কী হলো? ক্ষমতায় এসে বন্ধ করে দিল রাষ্ট্রীয় কর্মীদের বেতন, পেনশন। হচ্ছে ছাঁটাই। ৩ মার্চ '১২ পর্যন্ত গত দুমাসে আত্মহত্যা করেছেন দুজন পরিবহন শ্রমিক। ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে বা ফসল বিক্রি করতে না পেরে, মহাজনি দেনার ফাঁস এড়াতে, আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে কৃষকরা। খেতমজুরের কাজ নেই। তারা আরো প্রান্তিক হয়ে পড়েছেন। পথ বলতে মৃত্যু। হাসপাতালে শিশু মৃত্যু অব্যাহত। পরিবর্তন কোথায়? এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন অজুহাতে দায় এড়াত বিগত সরকার। মিথ্যা দিয়ে ঘটনাকে আড়াল করার চেষ্টা চালাত। আর এখন? মৃত পরিবহন কর্মীদের কর্মী হিসাবে মানতেই এরা নারাজ। আত্মহননকারী কৃষকরা নাকি কৃষকই নন! তারা নাকি ''অন্য কারণে'' দেনা করে ফেঁসে গিয়ে অথবা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে আত্মহত্যা করেছেন! হায়, মা-মাটি-মানুষের সরকার এখন তার বন্ধু(?) খেতমজুর, কৃষককেও চিনতে পারছে না, স্বীকার করছে না। গত ন মাসে মৃত শিশুরা 'মায়ের গর্ভে এসেছিল বামফ্রন্ট আমলে'! সেই কারণেই বোধহয় এই সরকারের হেলদোল নেই! এই কণ্ঠস্বরের মালকিনের মনে রাখা উচিত—বর্তমানে সরকারে অধিষ্ঠিত দলটির ভ্রূণাবস্থা ও জন্মগ্রহণ—সবই বামফ্রন্ট আমলে। তবে কি... ?

একের পর এক ধর্ষণ কাণ্ডে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থান ও অনাকাঙ্খিত বক্তব্যে পুলিশ প্রভাবিত হবেই। পুলিশ কমিশনার বলেছেন— সরকারকে কালিমালিপ্ত করতেই সাজানো হয়েছিলো পার্ক স্ট্রীট ধর্ষণ-কান্ডের গল্প— এ তো প্রশাসনিক বিবৃতি নয়, রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর মতো বক্তব্য। ধর্ষিতার চরিত্র, পেশা নিয়ে প্রশ্ন তখনও তোলা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডকে মন্ত্রীরা (এমনকি আইনমন্ত্রীও!) বলেছেন— জনরোষ, গণপ্রতিরোধের ফল। একই কথা বলানো হল পুলিশের বড় কর্তাকে দিয়ে। বামফ্রন্ট আমল থেকে পার্থক্য কোথায়? দুজনকে হত্যা করা হল বর্ধমানের দেওয়ানদীঘিতে। হতে পারে তারা সিপিএমের নেতা, প্রাক্তন বিধায়ক, হতে পারে তারা ঘৃণার পাত্র। কিন্তু অভিযুক্তদের পুলিশ হেফাজতে না নিয়ে জুডিশিয়াল কাস্টডিতে নিয়ে পুলিশ বুঝিয়ে দিল, তারা অভিযোগকে খুব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে না। খুনের মামলায় এটা অভিনব সন্দেহ নেই। দলীয় আনুগত্যই পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে প্রধান

বিবেচ্য— "বিচার দেবার আগে জেনে নাও দেগে দাও প্রশ্ন করো তুমি কোন্ দল"— শঙ্খ ঘোষ : তুমি কোন্ দলে।

কলেজে কলেজে দলীয় অনুগামী ছাত্র রাজনীতিতে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতার ক্ষেত্রেও একই কথা— আপনপক্ষ হলে ছাড়, অপরপক্ষ হলে মার (জেল)। এসব যদি প্রশাসন ও পুলিশের নিরপেক্ষতার নমুনা হয়, তাহলে বলতেই হবে— বামফ্রন্ট আমলেও তারা নিরপেক্ষ ছিল।

গণতন্ত্রের ঝলমলানি : তখন এখন

প্রচলিত সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কোনও সরকারই শ্রমিক-কর্মচারী-কৃষক-মেহনতি মানুষের বন্ধু হয় না— এমন একটা মত প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে— "রাজা আসে যায়/আসে আর যায়/শুধু পোষাকের রং বদলায়/শুধু মুখোশের ঢং বদলায়/দিন বদলায় না।"

ক্ষমতায় আসার আগে বিরোধী দল, তাদের নেতা-নেত্রীর স্বর ক্ষমতায় এসে কত বদলিয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৪৭ থেকে নিরবিচ্ছিন্ন কংগ্রেসি শাসনের অবসান ঘটে ১৯৬৭ সালে। এলো প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার। এটা ছিল কংগ্রেসি শাসনের দমবন্ধ করা অবস্থা এবং অন্যান্য জনবিরোধী ভূমিকার পরিণতি। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে দেওয়া হয় অন্যায়ভাবে। ১৯৬৯-এ ফের ক্ষমতায় এলো দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার। একেও ভেঙে দেওয়া হয়। দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়কাল অতি সংক্ষিপ্ত। এরপর ১৯৭০ থেকে '৭৭ এ রাজ্যে সিদ্ধার্থ রায় জমানা। বিরোধীদের উপর রাজনৈতিক তাণ্ডব, গুম-খুন, গণহত্যা, বিনা বিচারে জেলে আটক— কী ঘটেনি। জনবিচ্ছিন্ন কংগ্রেসকে মানুষ প্রত্যাখান করল— কেন্দ্রে, রাজ্যে। ১৯৭৭-এ এ রাজ্যে ক্ষমতায় এল বামফ্রন্ট। তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির উপর মানুষের তখন অগাধ আস্থা। তবে মানুষ ক্রমশ উপলব্ধি করল যে, তারা প্রতারিত হয়েছে। জনবিচ্ছিন্ন বামফ্রন্ট হটে গিয়ে এখন তৃণমূল ক্ষমতায়।

লক্ষণীয়ভাবে, বামফ্রন্টের গৃহীত চূড়ান্ত জনবিরোধী নীতি, সিদ্ধান্তগুলি এরা দ্রুত রূপায়ণ করতে তৎপর। এমন পদক্ষেপও নিচ্ছে, যেগুলি বামফ্রন্টও করতে সাহস পায় নি। দেশি-বিদেশি একচেটিয়া সংস্থার মালিক, বহুজাতিক কর্পোরেশনের প্রভুদের শর্ত মেনে নিয়েই সরকার চলছে। এই শর্ত পূরণের পথে হাঁটলে জনরোষ, প্রতিবাদ অনিবার্য। প্রতিবাদ আন্দোলনকে দমন করতে পুলিশে নির্বিচার নিয়োগের সিদ্ধান্ত। বিশেষত, পশ্চিম মেদিনীপুর বা জঙ্গলমহলের যেসব জায়গায় আদিবাসী ও সাধারণ মানুষ বিগত আমলে রুখে দাঁড়িয়েছিল— সেখান থেকেই প্রধানত হবে এই নিয়োগ। জানা নেই পুলিশ কোথায় ও কীভাবে উন্নয়নের কাজে অংশীদার হয়েছে। আসলে এ একধরনের উৎকোচ। চাকরির টোপ দিয়ে পক্ষে টানার চেষ্টা।

জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না

ক্ষমতাসীন দল চায় সবাই তার অনুগত হোক। সরকার, প্রশাসনকে কাজে লাগায় দলদাস তৈরিতে। কোনও আমলাই ব্যতিক্রম নয়। সরকার ও ক্ষমতাসীন পার্টি ভালমতোই জানে কোনো সিদ্ধান্ত বা নীতি রূপায়ণ বা কার্যকর করতে হলে তা করতে হবে প্রাথমিকভাবে সরকারি কর্মচারীদের মাধ্যমে। সেখানে যদি প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ওঠে তাহলে সিদ্ধান্ত রূপায়ণ সম্ভব নয়। তাই দরকার সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে অনুগামী বড়সড় সংগঠন— যা প্রয়োজনে লেঠেল যোগাবে, যাতে প্রতিবাদকে পুলিশ ছাড়াই দমন করা যায়। সিপিআইএম-এর এই বাহিনী ছিল। তারা অনেকেই শিবির বদলেছে। বর্তমান শাসকদের অনুগামী (বলা ভাল, ভক্ত) সংগঠনের সংখ্যা এত বেশি ও তাদের নেতৃত্বের মধ্যে সম্পর্ক এতই মধুর যে তাদের মুখ নয়, হাত-পা কথা বলে! তিনটেকে জুড়ে এক করতে গেলে তা হয়ে যায় চার বা পাঁচ। রণে ভঙ্গ দিয়ে তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীরা এখন মেতেছে কর্মচারীদের সংগঠন করার অধিকার খর্ব করার চেষ্টায়। শ্রমমন্ত্রী পূর্ণেন্দু বোসের কথায় হঠাৎ জানা গেল— সরকারি কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন বা সংগঠন করার অধিকার নেই। ১৯২৬-এর ট্রেড ইউনিয়ন আইন এটা নাকি অনুমোদন করে না!

ভারতের সংবিধান সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান যার আছে সে এই কথা বলবে না। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংগঠন করার অধিকার এসব তো মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে। দ্বিতীয়ত, সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন আইন ১৯২৬ খাটে না। নিয়োগকর্তা ও কর্মচারী— এমপ্লয়ার এন্ড এমপ্লয়ী— এই সম্পর্কের জায়গা থেকে কর্মচারীদের সংগঠন করা অধিকারের যৌক্তিকতা। এ অধিকার রাজ্য কর্মচারীদের কেউ দয়া করে দেয় নি। বহু সংগ্রাম ত্যাগের মধ্য দিয়ে অর্জিত এ অধিকার— তা আংশিক হলেও। বামফ্রন্টও তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারীদের চাকুরিবিধি বা ডব্লিউবিএসআর-এ অন্তর্ভুক্ত করে 'ডিউটিজ, রাইটস এন্ড অবলিগেশস্ অফ দি গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ীজ রূলস, ১৯৮০' (সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য, অধিকার ও দায়বদ্ধতা বিধি)-এর ৪নং ধারায় বলছে (১) প্রত্যেক কর্মচারীর এসোসিয়েশন/ইউনিয়ন/ফেডারেশন গঠনের অধিকার আছে; (২) ধর্মঘটের অধিকারসহ পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার আছে; (৩) রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়া ব্যতিরেকে কর্মচারীদের পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার আছে।

তবে এতে বেশ কিছু ফাঁক আছে। ১৯৭১-এর চাকুরিবিধি (প্রথম খণ্ড)-এর ৩গ (ক) ও (খ) ধারায় ধর্মঘটের প্রসঙ্গে কিছু নিয়ন্ত্রণ আছে। এই নিয়ন্ত্রণগুলি বামফ্রন্ট আমলেও সংশোধিত হয়নি। ১৯৫৯-এর কুখ্যাত কন্ডাক্ট রুলস্ বাতিলের কথা বলেও তা বহাল রাখে বামফ্রন্ট। এছাড়াও প্রবল কর্মচারী আন্দোলন দমন করতে ২০০৮-এর সেপ্টেম্বরে জারি করে মুখ্য সচিবের কালা সার্কুলার— আগাম অনুমতি ছাড়া মহাকরণে বিক্ষোভ-

জমায়েত-সভা করা যাবে না। তৃণমূল সরকারও এই পথেই হাঁটছে। গণতান্ত্রিক পরিসরকে বিস্তৃত, পূর্ণাঙ্গ করার বদলে তাকে আরও সঙ্কুচিত করে কর্মচারীদের ভয় দেখিয়ে দাবিয়ে রাখাই লক্ষ্য।

স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে সর্বভারতীয় শিল্প তথা সাধারণ ধর্মঘটকে কেন্দ্র করেও তৃণমূল সরকারের ভূমিকা ভীতি প্রদর্শনকারীর। ফরমান হলো— ঐদিন ছুটি মঞ্জুর হবে না। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং হুমকি দিলেন চাকুরি-ছেদের। কর্মচারীদের কার্যত পণবন্দী রাখা হলো। তাঁদের স্মরণ থাকা উচিত ১৯৯৫-তে জন্মের পর তৃণমূল দলটি অসংখ্য ধর্মঘট, বন্‌ধ ডেকেছে। ক্ষমতায় আসার জন্য রাজনৈতিক কারণে তাদের দরকার ছিল— তাই বন্‌ধ ডেকেছে। এরপর ক্ষমতায় আসা নিশ্চিত করতে ও ক্ষমতায় আসার পর গদি টিকিয়ে রাখতে তারা ধর্মঘটের বিরোধিতা করছে— এটাও রাজনৈতিক কারণেই। যদিও ২৮ ফেব্রুয়ারি '১২ ধর্মঘটের আহ্বায়কদের সম্পর্কেও সমালোচনার অবকাশ আছে। কিন্তু তা বলে দাবিগুলো মিথ্যা হয়ে যায় না। যে সরকার বিপুল জন সমর্থনের দাবিদার তাদের এত ভয় কীসের? কেন এত হম্বি-তম্বি? সরকার যখনই মনে করতে শুরু করে যে সকলে তার সুরে সুর মেলাবে, সকলে সরকারের ঠিক করে দেওয়া পথে হাঁটবে— সেখানেই গণতন্ত্রের দফারফা, স্বৈরতন্ত্রের শুরু। বলা হচ্ছে, ধর্মঘটে নাকি বিপুল শ্রম দিবসের অপচয় ঘটে, ধর্মঘট উন্নয়নের অন্তরায়'। পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে গত দু'দশকে বছরওয়ারি যত শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে তার মধ্যে লক আউটের ফলে নষ্ট হয়েছে ৭৫ থেকে ৯৯ শতাংশ পর্যন্ত। আর শিল্পক্ষেত্রে ধর্মঘটের ফলে? মাত্রই ১ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত!

মানুষজন এর মধ্যেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন— বাঘ আটকাতে যে খাল কাটা হল, সেই খাল দিয়ে কুমীর ঢুকবে নাতো! "দীর্ঘদিন কোনও সরকার ক্ষমতায় থাকলে সেই সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপই ফ্যাসিস্তদের মতো হয়" (তৃণমূল ইস্তাহার)। না, দীর্ঘদিন বা কম দিনের প্রশ্ন নয়। সরকার ও ক্ষমতাশীল দলের অবস্থান, অনুশীলনই চিহ্নিত করে ফ্যাসিবাদী প্রবণতা। এটা সময়কে, ইতিহাসকে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়ার দুর্লক্ষণ।

কমলকুমার মজুমদারের অননুকরণীয় ভাষায়— "বাবুগণ, নিশ্চিত জানিবেন তাঁর সম্মুখ গতি হেতু পিছনে হটে।" সিপিআইএম তথা বামফ্রন্টের জনবিরোধী ভূমিকার ফলে মানুষ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে '৭০-৭৭'-এর স্বৈর-শাসন ফিরিয়ে আনার কোনও প্রয়াস মানুষ মেনে নেবে। '২৩৫'-এর ক্ষমতা, ঔদ্ধত্য, দম্ভ কিন্তু এক লহমায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। শাসকের দম্ভ শেষ কথা বলে না।

মজুরদের ঝড়

ল্যাস্টন হিউজেস

অনুবাদ : সুকান্ত ভট্টাচার্য

এখন এই তো সময়—
কই? কোথায়? বেরিয়ে এসো ধর্মঘটভাঙা দালালরা,
সেই সব দালালরা—
ছেলেদের চোখের মতো যাদের ভোল বদ্‌লায়,
বেরিয়ে এসো।
জাহান্নমে যাওয়া মূর্খের দল,
বিচ্ছিন্ন, তিক্ত, দুর্বোধ্য
পরাজয় আর মৃত্যুর দূত—
বেরিয়ে এসো!
বেরিয়ে এসো শক্তিমান আর অর্থলোভীর দল
সংকীর্ণ গলির বিষাক্ত নিঃশ্বাস নিয়ে।
গর্তের পোকারা!
এই তো তোমাদের শুভক্ষণ
গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে পড়ো —
আর বেরিয়ে পড়ো ছোটো ছোটো সাপেরা
বড়ো আর মোটা সাপেদের যারা ঘিরে থাকো।
সময় হয়েছে,
আসরফি আর পুরনো অপমানের বদলে
সাদা যাদের পেট—
বংশগত সরীসৃপ দাঁত তারা বের করুক,
এই তো তাদের সুযোগ।
মানুষ ভালো করেই জানে
অনেক মানুষের বিরুদ্ধে একজনকে লাগাবার সেই পুরনো কায়দা।
সামান্য কয়েকজন লোভী
অনেক অভাবীর বিরুদ্ধে—
আর স্বাস্থ্যবানদের বিরুদ্ধে
ক্ষয়ে যাওয়ার দল।
সূর্যালোকের পথে যাদের যাত্রা
তাদের বিরুদ্ধে তাই সাপেরা।

অতীতে অবশ্য এই সাপেরা জিতেছে বহুবার।
কিন্তু এখন সেই সময়,
সচেতন মানুষ! এখন আর ভুল ক'রো না —
বিশ্বাস ক'রো না সেই সাপেদের
জমকালো চামড়ায় যারা নিজেদের ঢেকে রাখে,
বিপদে পড়লে যারা ডাকে
তাদের চেয়ে কম চটকদার বিষাক্ত অনুচরদের।
এতটুকু লজ্জা হয় না তাদের ধর্মঘট ভাঙতে
যে ধর্মঘট বেআব্রু ক্ষুধার চূড়ান্ত চিহ্ন।

—অবশ্য, এখনো কোনো সম্মানিত প্রতিষ্ঠান হয় নি
যার অজ্ঞাত নাম :
"ধর্মঘট ভাঙার দল"
অন্তত দরজায় সে নাম লেখা থাকে না।
ঝড় আসছে— সেই ঝড় :
যে ঝড় পৃথিবীর বুক থেকে জঞ্জালদের টেনে তুলবে।
আর হুঁশিয়ার মজুর :
সে ঝড় প্রায় মুখোমুখি।।

এখন পশ্চিমবঙ্গ

বিদ্যাস্থানে ভয়

মালবিকা সাহা

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন-পন্থীদের প্রতিশ্রুতি ছিলো 'দলতন্ত্র'-কে বিদায় দিয়ে 'গণতন্ত্র' পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। পুনঃ প্রতিষ্ঠা বলতে তাঁরা নিশ্চয়ই বামফ্রন্ট জমানার আগে নব্য কংগ্রেসী সিদ্ধার্থ রায় জমানার কথা বলছেন। তাঁদের কাজকর্মের গতি-প্রকৃতিও সেই ইঙ্গিত বহন করছে। নিয়মের ব্যতিক্রম হিসেবে 'ছোটো ছোটো ছেলেদের' 'দু-চারটে' 'গণতান্ত্রিক' ঘটনার কথা বাদ দিলে আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে। পরিবর্তনকে 'দৃশ্যমান' করার জন্য 'আরও সময় জুড়ে' অপেক্ষা করার কথা গণতন্ত্র এবং পরিবর্তনের সুহৃদবৃন্দ আমাদের গত কয়েক মাস ধরে শুনিয়ে আসছেন।

কয়েকটি সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে আলোচনা করা যাক। রামপুরহাট-রায়গঞ্জ-মাঝদিয়া। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি পরিচিত নাম। রায়গঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ পরিবর্তন-পন্থী কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠনের উঠতি নেতা-আধানেতা-র হাতে নিগৃহীত হলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এই অধ্যক্ষ-নিগ্রহ নিতান্তই 'বালক'-দের কান্ড। অস্ফুটবাক্ বৃষভ-এর প্রথম হুংকার বা সদ্য-সিং-গজানো ছাগলের যেখানে সেখানে গুঁতো মারার মতো স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু ৫৮ বছরের এক 'বালক' নেতা উপস্থিত থাকায় জোটসঙ্গী কংগ্রেসের এক সময়কার দাপুটে নব্যকংগ্রেসী ছাত্রনেতা পর্যন্ত দূরদর্শনে বলে বসলেন যে 'তিলকধারী' 'বালক' ছাত্রকর্মীর যা বয়স, তাতে তাঁকে বালক বলা বালখিল্যতার সমান। অতএব নিগ্রহকারীরা গ্রেপ্তার হলো জামিনযোগ্য ধারায়, অতএব তৎক্ষণাৎ জামিন। সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ, রায়গঞ্জ কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ (যিনি জোটসঙ্গী এবং ঘাসফুলের দরদী, অন্যথায় কর্মী) পুনরায় পরিবর্তনের হুমকির শিকার হয়েছেন!

রামপুরহাট কলেজের অধ্যক্ষ নিগ্রহের ঘটনাটি দৃশ্যমাধ্যম রায়গঞ্জের ঘটনার মতো পরিষ্কার করে দেখাতে পারেনি। অবশ্য তাতে অধ্যক্ষ নিগ্রহের মতো নিন্দনীয় ঘটনার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় না। স্থানীয় অধ্যাপক-(ঘাসফুল) বিধায়ক যিনি একদা ঐ কলেজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবেই যুক্ত ছিলেন এবং বর্তমানে যিনি শিক্ষা সংক্রান্ত সরকারের নানান জানা-অজানা কমিটির সদস্য, তিনি ঘন ঘন এমন সব বিচিত্র পরস্পর-বিরোধী বিবৃতি দিলেন, যে তা রং বদলের খেলায় বসন্ত উৎসবের বর্ণচ্ছটাকেও হার মানায়। অভিযোগ-পাল্টা-অভিযোগে যা বোঝা গেলো তাকে রাজনৈতিক পরিভাষায় 'গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব' আখ্যা দেওয়া হয়। ঘাসফুল-পন্থী স্থানীয় ছাত্র নেতারা দাবি করেছে যে তারা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মী হিসেবে শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য রুদ্ধ করার তাগিদেই এমন গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বস্তুত, ঐ কলেজে 'দলতন্ত্র'-র প্রতিভূ বলে বর্ণিত একটি পরিচিত বাম ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের তারা 'গণতান্ত্রিক পেশি' প্রদর্শন করে এলাকা ছাড়া করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা নেতৃত্ব বলেছেন দুধের বাছারা তাঁদের দলের সম্পদ। দিদির স্নেহধন্য এই সমস্ত ছোটো ছোটো ছেলেরাই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রূপায়ন করছে। কিন্তু স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক 'মেহের আলি'র প্রতিধ্বনিতে বলছেন : সব ঝুঠা হ্যায়—সচ্ হলো বামপন্থীদের চক্রান্ত!

মাঝদিয়া কলেজের অধ্যক্ষ পীড়নের ঘটনা এখনও পর্যন্ত দৃশ্যমাধ্যম দেখাতেই পারেনি। যা পাওয়া গেছে তা হলো এ সংক্রান্ত রিপোর্ট। তদন্তের আগেই এই ঘটনা যে বামপন্থী দলতন্ত্রের বিষময় ফল, এ বিষয়ে গণতান্ত্রিক বিবৃতির প্রেক্ষিতে আবার বামপন্থী ছাত্রদের হাজতবাস। তদন্তের আগেই এমন বিবৃতি দিয়ে তদন্ত প্রভাবিত করার খেলায় বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক গুরু সিদ্ধার্থ রায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তদন্ত কাজ প্রভাবিত করার জন্য একই অপরাধ করেও এদের দেওয়া হলো জামিন-অযোগ্য ধারার অভিযোগ। অবশেষে প্রমাণাভাবে আদালতের নির্দেশে এদের জামিন মিললো।

দুর্গাপুরের শিক্ষক বিমলবাবুকে (উনি এই নামেই আজও এমএএমসি কলোনির আশেপাশে পরিচিত) নব্য কংগ্রেসী সৈনিকবৃন্দ জীবন্ত দগ্ধ করে। তাঁকে একটি ঘরে পুরে বাইরে থেকে শেকল লাগিয়ে ঘরে অগ্নি সংযোগ করা হয়। দোহাই পাঠক! এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সাঁইবাড়ি বা সাম্প্রতিক প্রদীপ তা-কমল গায়েন হত্যাকে এক করবেন না। চোখ থেকে দলতন্ত্রের ঠুলিটা খুলে গণতন্ত্রের যুক্তিবাদী চশমাটা চড়ান (যেমন দলতন্ত্রের বিরোধিতা করে আসা কিছু বিদ্বৎজন সম্প্রতি ব্রহ্মদৃষ্টি এবং বৈতনিক পদ লাভ করেছেন) তাহলেই দেখবেন দলতন্ত্রে দলতন্ত্রে অনেক ফারাক আছে ভাইরে! সব দলতন্ত্র নয় সমান!

ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিগ্রহ 'গণতন্ত্র আবাহন'-এর জন্য অনেক ক্ষেত্রে পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে। সিদ্ধার্থ রায়-এর আমলে নব্যকংগ্রেসি ছাত্র সংগঠন খাড়াখাড়ি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়। 'মহাজাতি সদন পন্থী' এবং 'শিক্ষা-বাঁচাও কমিটি' নামে তারা তৎকালে পরিচিত ছিলো।

সমসাময়িক ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তৃণমূল কংগ্রেস দলটি এই কংগ্রেসি ঘরানার বাইরে অনন্য নয়। আদি কংগ্রেস নব কংগ্রেস-এর উদ্ভব-এর কালে কংগ্রেসের মধ্যেকার

সবচেয়ে ঐতিহ্যহীন পরিভাষায় যাদের লুম্পেন বলা হয়, সেই অংশটি নব্য অংশাটিতে ভীড় জমায়। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের ফলে হাতমার্কা কংগ্রেস থেকে উদ্ভূত তৃণমূল কংগ্রেসে আবার নব্য কংগ্রেসিদের সবচেয়ে অধঃপতিত অংশটি ভীড় করে। ঠিক এই কারণেই সত্তর সমাজের তুলনা আনা এবং কিছু কিছু মারাত্মক ঘটনার পুনরুদ্ধার জরুরি। অতীতের 'শিক্ষা বাঁচাও কমিটি' এবং 'মহাজাতি সদন' পন্থী ছাত্র পরিষদের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব আজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদ বনাম কংগ্রেসি ছাত্র পরিষদের দ্বন্দ্ব রূপে আবির্ভূত হচ্ছে।

কিন্তু বিদ্যাস্থানে ভয়-এর কারণ নিহিত অন্যত্র। এতক্ষণ যা বলা হলো তা নিতান্তই হিমশৈলের চূড়া— শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের কারণ নয়, তার ফলমাত্র। এখন আসল কারণ-গুলোকে সামনে আনা জরুরি— আজকের আর আগামীকালের খাতিরেই।

ভারত সরকার যখন গাট্স (GATT অর্থাৎ বিশ্বায়ণ রূপায়নের যে চুক্তিটিতে শিক্ষাকে পণ্য করার আয়োজন বর্ণনা করা হয়েছে) স্বাক্ষর করে তখন তৃণমূল সরকার কেন্দ্রের এই পদক্ষেপের উৎসাহী সমর্থক ছিলো। এখন রাজ্যে ক্ষ মতায় আসীন হয়ে তারা সেই চুক্তির বিভিন্ন ধারা রূপায়ণের কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে। এই চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিলো শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সংস্থার গুরুত্ব কমিয়ে, নির্বাচিত প্রতিনিধির পরিবর্তে মনোনীত প্রতিনিধি গোষ্ঠী দ্বারা শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। এই লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসীন হয়েই তৃণমূল সরকার রাজ্যের প্রতিটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত সমস্ত সংস্থা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করে। সুশাসন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বাম-নামধারী দুর্বৃত্তদের হাতে পড়ে গণতান্ত্রিক কাঠমোর যে দুর্দশা ঘটেছিলো সেই ক্ষোভকে পুঁজি করে তৃণমূল ডাণ্ডাধারীরা তাদের চেয়েও হয়ে উঠেছে এক কাঠি উপরে। শিক্ষাব্রতীদের মুখে থুথু ছেটানো মেজ তৃণমূল নেতা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষা সংস্থায় মনোনীত প্রতিনিধি হয়ে যান। পরে থুথু ছেটানোর কেলেঙ্কারিটি জানাজানি হলে তাঁকে সাময়িকভাবে সরিয়ে নেওয়া হয়।

আগাগোড়া অশুদ্ধ ভাষায় অসাংবিধানিক যে বিজ্ঞপ্তিটি জারি করে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ-র সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণকারী সংস্থাগুলো ভেঙ্গে দেওয়া হলো, তা বন্ধু-শত্রু নির্বিশেষে সবার কাছেই এক হাসির গল্পের মতো। তারপর গাট্স মোতাবেক নির্বাচিত সংস্থার বিপরীতে মনোনীত সংস্থা গঠনের যে সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলো তা এতটাই ভুল, পরস্পর বিরোধী ধারা-উপধারা কণ্টকিত যে জনশ্রুতি, রাজ্যপাল স্বয়ং অনেক সংশোধনী সুপারিশ করে তা ফেরত পাঠান। শেষ পর্যন্ত এক সমঝোতা-ফর্মুলায় উপনীত হয়ে সরকার প্রায় পঁচিশটি ভুল ইংরাজি রাজ্য সম্বলিত দ্বিতীয় একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করে যেটির ভিত্তিতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বি-স্তরীয় শিক্ষা সংস্থার প্রথম স্তরটি গঠিত হয়েছে বা গঠিত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে চূড়ান্ত নীতিনির্ধারক সংস্থাগুলি (কোর্ট, কাউন্সিল বা সিন্ডিকেট-বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সংস্থাটির নাম বিভিন্ন) গঠিত হবে। এই চূড়ান্ত সংস্থায় মনোনীত প্রতিনিধির সংখ্যা বেশি থাকবে, নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা থাকবে কম। ছাত্র, গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারি বা আধিকারিকদের কোনও নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকবে না। আগের সংস্থাগুলো যতই অগণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হতো না কেন, আইনত সেই সমস্ত সংস্থায় শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত প্রতিনিধিদের নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ ছিলো। বর্তমান আইনে যে সংস্থাগুলি গঠিত হবে তাতে আইন মতেই নির্বাচিতদের পরিবর্তে প্রাধান্য থাকবে— মনোনয়ন করবেন একদল ব্যক্তির পরিবর্তে মাত্র একজন— মাননীয় উপাচার্য মহাশয়।

উচ্চ শিক্ষা সংসদ নামক যে সংস্থাটি গঠিত হয়েছে তা পুরোপুরি সরকারি নিয়ন্ত্রণে। সংস্থাটিকে গঠনের দিন থেকে আজ পর্যন্ত পঠন-পাঠন-গবেষণা নিয়ে একটি বাক্যও ব্যয় করতে কেউ শোনেনি, কিন্তু উপাচার্য বরখাস্ত, নির্বাচিত মান্য-পণ্ডিত সংস্থা ভেঙে দেওয়ার সুপারিশ, ছাত্র সংসদ নির্বাচনের নিয়মাবিধি প্রণয়নের মতো 'বিদ্যাচর্চা'-তেই ব্যাপৃত থাকতে দেখা গেছে। তাঁদের খাম-খেয়ালিপনার শিকার হচ্ছেন শিক্ষাবিদ্‌রা। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য পদত্যাগ করলে কলকাতার একজন শিক্ষককে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে সাময়িকভাবে উপাচার্যের ভার নেওয়ার জন্য নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি সেই কার্যভার গ্রহণ করতে পারেননি— কেননা ঐ কার্যভার দেওয়া বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনমত সম্পূর্ণ বেআইনি। অতএব সেই শিক্ষক নিয়োগপত্র হাতে পেয়ে অপেক্ষা করতেই থাকলেন, ইত্যবসরে শেষ পর্যন্ত আইন মেনে সরকারকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্যকে সাময়িকভাবে উপাচার্য নিয়োগ করতে হলো।

আরও মজার ঘটনা ঘটলো পশ্চিমবঙ্গ কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ক্ষেত্রে। শিক্ষামন্ত্রী এবং উচ্চ শিক্ষা সংসদ একযোগে হুংকার দিলেন যে এই উপাচার্য 'দুর্নীতিগ্রস্থ'। 'আর্থিক কেলেঙ্কারির নথিপত্র' 'শিক্ষামন্ত্রকে জমা পড়েছে'। মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীও এই একই সুরে সুর মেলালেন। জনশ্রুতি হলো কোনও একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের একজন পড়ুয়াকে যেন 'পাশ করিয়ে দেওয়া হয়' এই মর্মে বর্তমান মন্ত্রিসভার একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর আপ্ত-সহায়ক উপাচার্য মহোদয়কে 'অনুরোধ' (অন্য ভাষ্য মতে 'হুমকি') পাঠান। এই মর্মে, আবারও জনশ্রুতি (উপাচার্য একটি সাক্ষাৎকারে এমন ইঙ্গিতও দিয়েছেন) যে দ্বিতীয়বার, অন্য একজন পরীক্ষক দিয়ে পরীক্ষা নেওয়ার পর জনৈক সেই

পড়ুয়াটি অকৃতকার্য হয়। আইনমতে আর 'পাশ' করার রাস্তা না থাকায়'দুর্নীতি'-র অভিযোগ ইত্যাদি উঠে আসে। উপাচার্য এই সব অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ করেন, রাজ্যের অন্যান্য অনেক উপাচার্যবৃন্দ সেই প্রতিবাদে সামিল হন। এই সম্মিলিত প্রতিবাদের পরে জানা যায় যে উপাচার্যর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগই শিক্ষা দপ্তরে জমা পড়েনি, তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক সাক্ষ্য-প্রমাণও নেই। সর্বোপরি, উপাচার্যের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিযোগ করা উচ্চ শিক্ষা সংসদ বা শিক্ষা দপ্তরের এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজ!

সম্প্রতি শোনা গেলো আদালত নির্দেশ দিয়েছে যে অতঃপর উচ্চ শিক্ষা সংসদের ছাত্র সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত নির্দেশিকার অনুপস্থিতিতে রাজ্য নির্বাচন কমিশন ছাত্র সংসদের নির্বাচন পরিচালনা করবে। ছাত্র সংসদের নির্বাচন একান্তভাবেই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব গণতান্ত্রিক পরিসরের আওতায় এবং তা এতদিন পরিচালিত হয়ে এসেছে শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের দ্বারাই। এটাই শোভন এবং সুস্থ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অঙ্গ। পুলিশ বা সামরিক বাহিনী নিয়ে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্বাচন করা যায় না বা দক্ষ পুলিশ অফিসারকে বিজ্ঞান বা সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রদানের কমিটিতে রাখা শোভন নয়, তেমনি রাজ্য নির্বাচন কমিশনের আওতায় ছাত্র সংসদের নির্বাচন পরিচালনা হাস্যকর। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রাজনীতির অনুপ্রবেশ' রোধ করার জন্য গাট্স চুক্তি মোতাবেক ভারত সরকার লিংডো কমিশন নিয়োগ করেছিলো। এই লিংডো কমিশন শিক্ষাক্ষেত্রের প্রতিটি স্তরে নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধি কমানোর সুপারিশ করে, ছাত্র সংসদ নির্বাচনের সময়ে প্রার্থীদের নিজস্ব মতামত প্রকাশের অধিকারের ওপর নির্লজ্জভাবে অগণতান্ত্রিক শর্তাবলী চাপানোর সুপারিশ করে। তৃণমূলের 'দলতন্ত্রবিরোধী' 'গণতান্ত্রিক পরিবর্তন'-এর সরকার রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে লিংডো কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচন পরিচালনার জন্য অনুরোধ করেছেন!

সবশেষে বিদ্যাস্থানে ভয়-এর আসল বিষয়টির অবতারণা করা যাক। গাট্স-এর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ছিলো শিক্ষাক্ষেত্রে কর্ম সংকোচন। বামফ্রন্ট সরকারও প্রায় একই রকম বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে যে পদক্ষেপ গ্রহণে খানিকটা দ্বিধান্বিত ছিলো, তৃণমূলের সরকার সেই দ্বিধার অবসান ঘটিয়ে পরিবর্তনের জন্ম দিয়েছেন। তাঁরা ক্ষমতায় এসেই শিক্ষাক্ষেত্রে সব রকম নিয়োগের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন যা আজও বহাল রয়েছে। দ্বিতীয়ত তাঁরা শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের সমস্ত আইন মোতাবেক পদোন্নতি, যা তাঁদের চাকরির নিয়োগ পত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে, তা সাময়িকভাবে স্থগিত ঘোষণা করেছেন। অবসর নিচ্ছেন যে সব শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা সেই পদে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ওপরও নিষেধাজ্ঞা জারি আছে। অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ প্রায় বন্ধ— যেখানে হচ্ছে সেখানে নির্মাণশিল্পের মতো স্থানীয় বিধায়ক পরিচালিত 'সিন্ডিকেট'-এর মাধ্যমে নিয়োগ করা প্রায় বাধ্যতামূলক।

কলেজ সার্ভিস কমিশন ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত— বহুদিন তারা শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত কোনও বিজ্ঞাপন দেয়নি। আর সম্ভবত তারা বিজ্ঞাপন দিতেও পারবে না। হয়ত এই কমিশন গুটিয়েও নেওয়া হবে। কেন না সম্প্রতি সরকার ফতোয়া জারি করে বলেছে যে, যে সমস্ত কলেজে পূর্ণ সময়ের শিক্ষকের অভাবে সাময়িকভাবে পঠন চালু রাখার জন্য আংশিক সময়ের শিক্ষক রয়েছে, অতঃপর এই আংশিক সময়ের শিক্ষকদের দিয়েই পূর্ণ সময়ের শিক্ষকদের কাজ চালাতে হবে। কলেজ কর্তৃপক্ষ নিজ নিজ কলেজে শূন্যপদ হিসেব করার সময় যে সব শূন্যপদে সাময়িকভাবে পঠন বজায় রাখায় জন্য এক বা একাধিক আংশিক সময়ের শিক্ষক নিযুক্ত রয়েছেন সেই পদগুলির জন্য এখন আর কলেজ সার্ভিস কমিশনের কাছে পূর্ণ সময়ের শিক্ষক চাইতে পারবেন না। গত বছরের হিসেব মতো সারা পশ্চিমবঙ্গের সব কটি কলেজ মিলিয়ে সরকার ও ইউজিসি (বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন) স্বীকৃত প্রায় ৩৩০০টি পূর্ণ সময়ের পদ শূন্য পড়ে আছে। প্রতিটি কলেজে প্রয়োজনের তুলনায় কোথাও ৪৫ শতাংশ বা কোথাও ৭০ শতাংশ পূর্ণ সময়ের শিক্ষক পদ শূন্য। কলেজগুলোতে পঠন-পাঠন চলছে এই আংশিক সময়ের শিক্ষকদের ওপর ভিত্তি করেই। এমতাবস্থায় সরকারের এই নতুন ফতোয়ার ফলে মাত্র ৩০০টির মতো পূর্ণ সময়ের শিক্ষক পদে শিক্ষক নিয়োগ হয়ত আদৌ সম্ভব হবে— ৩০০০টি পূর্ণ সময়ের শিক্ষক পদ আপাতত পূরণ হবে না। এই পদগুলি কালক্রমে লুপ্ত হয়ে যাবে। আবার যে ৩০০টি পদ পূরণ সম্ভব, নতুন ফতোয়ার চাপে পড়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ পূর্ণ সময়ের শিক্ষক পাওয়ার দুরাশায় সেই পদগুলিতে আর আংশিক সময়ের শিক্ষক নিয়োগ করবেন না। এর ফলে ছাত্রদের পঠন-পাঠন গুরুতর রূপে ব্যাহত হবে সন্দেহ নেই।

বিদ্যালয় শিক্ষার বিষয়টির সঙ্গে সম্ভবত একমাত্র মাৎস্যন্যায়ই তুলনীয়। প্রথমে শোনা গেলো বিদ্যালয় সার্ভিস কমিশনের আগেই একটা পরীক্ষা নেওয়া হবে। পরে শোনা গেলো, না হবে না। আবার শোনা যাচ্ছে, হবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে ক্ষেত্রে যে অঞ্চল-ভিত্তিক ইন্টারভিউ-এর ব্যবস্থা ছিলো তার পুনর্গঠন হবে— সে প্রক্রিয়া সবে শুরু হয়েছে। কিন্তু শূন্য পদের তুলনায় নিয়োগ শোচনীয় ভাবে কম। পার্শ্ব শিক্ষক নিয়ে গল্পটি কিরীটি রায়ের গোয়েন্দা কাহিনীকেও হার মানায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অস্থায়ী শিক্ষকদের বঞ্চনা।

এই অস্থায়ী শিক্ষকদের বিষয়টি একটু বিশদে বলা প্রয়োজন। বিদ্যালয় শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার

দ্বারা অনুমোদিত মাদ্রাসা, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যাদানের জন্য স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। শিক্ষাকে পণ্যে পর্যবসিত করতে হলে (যা কিনা গাট্‌স-এর অন্যতম এ্যাজেন্ডা) শিক্ষাকে 'প্রসারিত' করতে হবে যাতে ক্রেতার কাছে পণ্য পৌঁছায় প্রয়োজনীয় পরিমাণে। সরকার তাই শিক্ষার অধিকার আইন তৈরি করলো, যার জন্য এখন দূরদূরান্তে শিক্ষা-ব্যবসা পরিচালনার জন্য বিদ্যালয় নামক বিপণনকেন্দ্র খুলতে হবে। এই বিপণনকেন্দ্র খুলবে বেসরকারি শিক্ষা ব্যবসায়ীবৃন্দ। মুনাফার জন্য তারা পূর্ণ সময়ের শিক্ষক নিয়োগ করবে না। একটি পূর্ণ সময়ের শিক্ষকের বদলে তারা তিনজন আংশিক সময়ের শিক্ষক নিয়োগ করবে অনেক কম মজুরিতে। আর কে না জানে মজুরির টাকা চুরি ব্যবসায়ীদের মুনাফার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। আইন বলছে যে এখন থেকে বিদ্যালয় স্তরে প্রতি ৩৫ জন ছাত্র পিছু ১ জন শিক্ষক থাকা বাধ্যতামূলক (বর্তমানের বাস্তব চিত্র হলো প্রতি ৭৫-৮০ জন ছাত্র পিছু একজন শিক্ষক!)। অতএব প্রয়োজন কর্মীদের অস্থায়ীকরণ। পূর্বতন বাম সরকার ঠিক এই কাজটিই করেছিলেন। তাঁরা শিক্ষার মান উন্নয়ন কল্পে সারা রাজ্যে প্রায় ১০,০০০ অস্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করেছিলেন। এই শিক্ষকদের পারিশ্রমিক ৫০০ থেকে ২৫০০ টাকা পর্যন্ত। এঁরা সপ্তাহে ৩০টির বেশি ক্লাস নেন— পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, পরীক্ষায় নজরদারি ইত্যাদি বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি বিষয়ে পূর্ণ সময়ের শিক্ষকের সমান দায়িত্ব পালন করেন। গ্রামাঞ্চলে প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে, বিশেষত বুনিয়াদি এবং মাধ্যমিক স্তরে এই শিক্ষকদের সংখ্য, পূর্ণ সময়ের শিক্ষক সংখ্যার প্রায় সমান সমান। পশ্চিমবঙ্গের কুড়িটি জেলার গড় হলো খানিকটা এরকম: যে সমস্ত বিদ্যালয়ে ৫০ জন পূর্ণ সময়ের শিক্ষক থাকার কথা, সেখানে রয়েছে ২২ জন পূর্ণ সময়ের শিক্ষক আর ২৮ জন হলেন এই অস্থায়ী শিক্ষক। ৩০ জন স্থায়ী শিক্ষক যেখানে থাকার কথা সেখানে রয়েছে ১৪ জন স্থায়ী শিক্ষক এবং ১৬ জন এই অস্থায়ী শিক্ষক। এই সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা দীর্ঘদিন এক একটি বিদ্যালয়ে পঠন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। এই শিক্ষকদের প্রত্যেকেরই স্কুল সার্ভিস কমিশন নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে— বেশির ভাগই বিএড পাশ।

পরিবর্তনের সরকার অধিষ্ঠিত হওয়ার পর, মা-মাটি মানুষের স্বার্থে এই অস্থায়ী শিক্ষকদের কোনও কারণ না দর্শিয়েই যথেষ্ট সময় না দিয়েই বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই তাঁদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। হয়ত এঁদের পরিবর্তে 'গণতান্ত্রিক দলতন্ত্র' অনুশীলন করে কাউকে নিয়োগ করা হবে, যার ইঙ্গিত এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বাহাত্তর-সাতাত্তর-এর টুক্‌লি বিপ্লব, স্বজন-পোষণ, ঢালাও ডিগ্রি প্রদান, গোপনে প্রশ্নপত্র বলে দেওয়া চলেছিলো অবাধে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীও মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুর আগেই নিজের এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে ঘোষণা করেছেন যে একটি বিশেষ সেট-এর প্রশ্নপত্র এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ব্যবহৃত হবে।

বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রীর অতি প্রিয় বিষয় হলো পি-পি-পি মডেল। তাঁর মতে এই মডেলে সরকারি সম্পত্তি ভোগ-দখল করবে বেসরকারি প্রমোটার। আর সরকার বহন করবে ক্ষতির দিকটা, অর্থাৎ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, নজরদারি ইত্যাদি। ডিমের খোলাটা সরকারের আর ডিমের হলুদ আর সাদা অংশ পড়ছে বেসরকারি প্রমোটারের ভাগে— মুখ্যমন্ত্রীর পি-পি-পি মডেল মোতাবেক। শিক্ষাক্ষেত্রে যাবতীয় অরাজকতার বিরুদ্ধ আন্দোলন-বিক্ষোভকে চক্রান্ত আর রাষ্ট্রদ্রোহিতা হিসেবে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত করে আসলে এই সরকার গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করতে চাইছে। একবার গণতন্ত্র নিহত হলে শিক্ষাক্ষেত্রে পি-পি-পি বা নয়া আর্থিক নীতি রূপায়ণ করা সহজ হবে— যাবতীয় কল্যাণমূলক পরিষেবাকে পণ্যে পর্যবসিত করাও সহজ হবে। বিদ্যাস্থানে ভয় তাই অমূলক নয়— বাস্তব। বিশ্বায়ন সম্পৃক্ত 'গণতান্ত্রিক দলতন্ত্র' আমার বাংলায় আঁধার নামার পশ্চাৎভূমি প্রস্তুত করছে।

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান: পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপলস বুক সোসাইটি, বই-চিত্র, অমর কোলের স্টল (বিবাদি বাগ), অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধানসভা পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ডা. শুভজিত ভট্টাচার্য (উষুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া), শিয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন স্টেশনে বইয়ের স্টল

পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার ফোন নম্বর: ৯৮৩০৯ ২২১৯৪ বা ৯৩৩১৯ ১২৫৩৭

পশ্চিমবঙ্গে প্রতিশোধ ও হিংসার পুনরাবৃত্তি বন্ধ কর

পশ্চিমবঙ্গে দৈনিক ধারাবাহিক হিংসার যে খবর আসছে, তা অত্যন্ত দুশ্চিন্তা উদ্রেককারী। সাংবাদিকরা শাসক দলের সভ্যদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেন। শিক্ষকদের নয়া শাসনতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যের প্রমাণ দিতে হচ্ছে। না পারলে তাঁদের দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়া হচ্ছে এবং সুপরিকল্পিত শারীরিক নিগ্রহের শিকার হতে হচ্ছে।

সিপিএম-এর সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষজন আর্থিক জুলুমের হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে এবং এমন খবরও পাওয়া যাচ্ছে, তাদের জীবিকার্জনের পথগুলিও রুদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। নিয়মমাফিক বিরোধী রাজনীতিও বরদাস্ত করা হচ্ছে না। শুধু সিপিএম-এর সাধারণ সদস্যরা নন, প্রবীণ নেতাদেরও ছাড় দেওয়া হচ্ছে না। সম্প্রতি সিপিএম-এর এক প্রাক্তন বিধায়ক সহ অপর এক নেতা শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত গণ-হিংসায় নিহত হয়েছেন। মিছিলের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক আহূত সাম্প্রতিক বন্ধের সমর্থকদের হেনস্থা করার ঘটনাও ঘটেছে।

মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে বন্ধ সমর্থকদের 'মনে রাখার মতো শিক্ষা দেওয়ার' হুমকি দিয়েছেন। এরই সঙ্গে সঙ্গে শাসক দলের সদস্যরা ধর্মঘটিদের উপর আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। এই সব ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা হয় নীরব দর্শক অথবা প্রশ্রয় দাতার।

সবথেকে বেদনাদায়ক বিষয় হলো, সাম্প্রতিক ধর্ষণের ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির প্রতিক্রিয়া। 'এগুলো গল্প এবং সাজানো ঘটনা'— তাঁর এই মন্তব্য এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যেখানে নারী নির্যাতনের ঘটনাগুলি সম্বন্ধে হয় অভিযোগ দায়ের হবে না অথবা পুলিশ অভিযোগ নিতেই অস্বীকার করবে। অপরাধীদের গ্রেপ্তার করার জন্য সক্রিয় হওয়ার কথা ছেড়েই দিলাম।

এটা গভীর পরিতাপের বিষয় যে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হয় পশ্চিমবঙ্গে হিংসাত্মক ঘটনাগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করছেন অথবা এগুলো জনরোষের ফলশ্রুতি বলে বৈধতা অর্পণ করছেন। অদৃষ্টের পরিহাস এটা যে, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম বা লালগড়ের হিংসাত্মক ঘটনার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী শাসক দল একই যুক্তি দিয়েছিল। আমরা দেখছি শাসক দলের সদস্যরাই শৃঙ্খলারক্ষাকারীর ভূমিকা নিয়েছে। দল এবং সরকারের বিভাজন রেখা ভয়ঙ্কর ভাবে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে।

দুঃখের কথা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র একটি রাজনৈতিক দল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পরিস্থিতি থেকে বাংলাকে মুক্ত করার ইচ্ছা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি যে আস্থা স্থাপন করা হয়েছিল, তা এখন স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা করতে অপব্যবহৃত হচ্ছে। গভীর উদ্বেগের বিষয় যে, বাংলার রাজনীতি প্রতিশোধ এবং হুমকির ভাষায় পরিচালিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক কার্যকলাপ বজায় রাখার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার সময় উপস্থিত হয়েছে।

আমরা এই প্রদেশের রাজ্যপাল এবং সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বকে এই প্রক্রিয়া শুরু করার আবেদন জানাচ্ছি। বাংলার জনগণের প্রতিও আমাদের আবেদন, হিংসার সংস্কৃতি এবং রাজ্যের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে যা আচ্ছন্ন করে রেখেছে, সেই ক্ষুদ্র গোষ্ঠিতন্ত্রের বিরোধিতা করুন। জনসমাজে শোভনতার নতুন আদর্শ ও গণতান্ত্রিক ব্যবহারবিধি প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগ গ্রহণ করুণ।

আদিত্য নিগম (সিএসডিএস, দিল্লী), এ মার্কস (চেন্নাই), আনন্দ পট্টবর্ধন (মুম্বাই), অপূর্বানন্দ (দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়), আর্শাদ আজমল (সাহ্‌লাত, দিল্লী ও পাটনা), দিলীপ সিমিয়ন (দিল্লী), দেবিকা জয়কুমারী (সিডিএস, থিরুভন্তাপূরম), দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য (সিএসএসসি, কলকাতা), দ্বিজেন্দ্র কালিয়া (দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়), গৌতম ভান (দিল্লী), কবিতা শ্রীবাস্তব (পিইউসিএল, জয়পুর), কুমার রাণা (প্রতীচি, কলকাতা), মধুমিতা দত্ত (চেন্নাই), মুকুল প্রিয়দর্শিনী (দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়), মুকুল শর্মা (দিল্লী), মুসাব ইকবাল (নিউজফার্স্ট, বাঙ্গালোর), নাসিরুদ্দিন হাইদর খান (হিন্দুস্থান, দিল্লী), নিবেদিতা মেনন (জেএনইউ, দিল্লী), প্রীতম মুখার্জি (কলকাতা), পুষ্কর (পিইউসিএল, দিল্লী), সত্য শিভরামণ (দিল্লী), শবনম হাসমী (আনহাড, দিল্লী), শিভম ভিজ (দিল্লী), সুধাব্রত সেনগুপ্ত (দিল্লী), সুভায গাতাদে (সন্ধান, দিল্লী), শুক্লা সেন (মুম্বাই), সুমিত সরকার (দিল্লী), সুনলিনী কুমার (দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়), তনিকা সরকার (দিল্লী)

সূত্র: 'কাফিলা', ৪ মার্চ ২০১২ (ভাষান্তরিত)

পরিবর্তনের পশ্চিমবঙ্গে শ্রমজীবী জনগণ

গৌতম সেনগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তন-এর সরকার কায়েম হয়েছে ২০ মে, ২০১১ এবং তারপর ন' মাস কেটে গেছে। 'পরিবর্তন'-এর কান্ডারী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জীর ঘোষণা অনুযায়ী গত জমানার দলতন্ত্র উচ্ছেদ করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'মা-মাটি-মানুষ'-এর সরকার। একথা আশাকরি চরম নিন্দুকেও বলবেন না যে তিনি নির্বাচনী কারচুপি করে ক্ষমতায় এসেছেন। গত বিধানসভা নির্বাচনে এ রাজ্যের নির্বাচকদের প্রায় ৮০ শতাংশ ভোট দিয়েছিলেন এবং এই নির্বাচকদের সংখ্যাগুরু ভোট গিয়েছিল বামফ্রন্টের দলগুলির বিরুদ্ধে। ফলে সিপিএম নেতৃত্বাধীন ফ্রন্ট পড়ে চরম নির্বাচনী বিপর্যয়ের মধ্যে।

ক্ষমতায় আসার পর নতুন সরকার সিঙ্গুরের প্রস্তাবিত ন্যানো কারখানার জমি, বলা ভালো অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি, ফিরিয়ে দেবার জন্য একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে। তারপর কানা নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেলেও অনিচ্ছুক কৃষকরা জমি ফেরত পান নি। আদৌ পাবেন কিনা এ কথা সরকার বা সরকারি দল কেউই নিশ্চিত করে বলছেন না। বলা যায় কলকাতা হাইকোর্ট সুপ্রীম কোর্ট হয়ে 'মামলা' বিচারাধীন আছে। দৈনিক সংবাদপত্র বা চ্যানেলে এটি আর 'ব্রেকিং নিউজ' হয় না সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষক বা দুর্দশাগ্রস্ত খেতমজুরদের মুখগুলো। নতুন 'উন্নয়ন'-এর হোর্ডিং-এ ঢাকা পড়েছেন তাঁরা।

নন্দীগ্রাম গুলিচালনায় মৃত, আহত বা ক্ষতিগ্রস্ত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মোতাবেক ক্ষতিপূরণ পয়েছেন। কিন্তু ঘটনায় প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষভাবে যুক্ত পুলিশ আধিকারিকরা শাস্তি-সাজা পাওয়া দূরের কথা, তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত হয়েছে, হচ্ছে বা হবে এমন কথা এখনও শোনা যায়নি। বরং কারো কারো পদোন্নতিও হয়েছে। ঠিক যেমনটা ঘটেছিলো ৩৪ বছর আগে, রুনু গুহনিয়োগীদের ক্ষেত্রে। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় জমানার কুখ্যাত এই পুলিশকর্মী পদোন্নতির শিখরে পৌঁছেছিলেন জ্যোতি বসুর জমানায়। নন্দীগ্রাম আন্দোলন সম্ভবত বুদ্ধদেব জমানায় নব্য উদারনীতি প্রয়োগের দানবীয় প্রয়াসের যোগ্য জবাব দিতে পেরেছিলো এক জঙ্গি গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে। নন্দীগ্রামে শিল্প গড়তে এসেছিলো ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিস্ট ঘাতক সালিম-শ্রীপুত্রা গোষ্ঠী। তখন তাদের সহযোগী ছিলো শিল্পপতি নামে পরিচিত হলেও আসলে প্রমোটার প্রসূন মুখার্জী। বর্তমান 'মা-মাটি-মানুষ'-এর সরকার সেই ব্যক্তির হাতে বাস্তুসংস্থানগত-ভাবে ভঙ্গুর (ecological fragile) নয়াচর তুলে দিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ নয়াচরে প্রসূন মুখার্জীর ভবিষ্যত প্রকল্পের সঙ্গী সালিম-শ্রীপুত্রা হবেন না এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। বিশেষত হলদিয়ার অত্যন্ত কাছে নয়াচরের স্থানিক গুরুত্ব অর্থনৈতিক বিচারে খুবই লাভজনক। নন্দীগ্রামের বাতাসে কান পাতলে তাই শুনতে পাওয়া যায় সিপিএম-এর হার্মাদ বাহিনীর হাতে মৃত-মৃতা-নির্যাতিতাদের হাহাকার আর 'পরিবর্তন'-এর কুশীলবদের বিরুদ্ধে ফিস্‌ফাস্।

গত বাম জমানায় ৯০ দশকের মাঝামঝি সময়ে শ্রমিক আন্দোলনের মরা গাঙে স্রোতের দেখা পাওয়া গিয়েছিলো কানোরিয়া পাটকলের শ্রমিকদের এক দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শ্রমনিবিড় এবং ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জনসচেতনা এক ধাক্কায় অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছিলো সেই আন্দোলন। বর্তমান শ্রমমন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু ছিলেন এই আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। সুতরাং সরকারি উদ্যোগে এই কারখানা খোলা হল এবং খোলা হল মালিকরূপী প্রোমোটার পাসারির হাত ধরে। কানোরিয়া আন্দোলন পাট শিল্পে এই প্রোমোটারি রাজের বিরোধিতা করেছিলো সজোরে। এই আন্দোলনের মাধ্যমে আওয়াজ উঠেছিলো অবসরপ্রাপ্ত ও কর্মরত পাটকলের শ্রমিকদের পিএফ, গ্রাচুইটি, ইএসআই-এর টাকা মেরে দেবার (বে)আইনি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। আর সম্প্রতি কারখানা খুললো এসব অসীমাংসিত রেখেই। অর্থাৎ অবসরপ্রাপ্ত কানোরিয়া শ্রমিকরা নায্য অবসরকালীন সুবিধা কবে পাবেন জানা নেই। কিন্তু প্রমোটার পাসারি তার মুনাফার টাকা নিয়ে ঘরে ফিরবেন 'মা-মাটি-মানুষ'-এর দেওয়া সরকারি নিরাপত্তায়। ৬ মাসেরও বেশি হলো কারখানা খুলেছে, কিন্তু কানোরিয়া আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ওঠা কোন প্রশ্নের মীমাংসা হয় নি।

হুগলী জেলার বা বলা উচিত পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম নামী শিল্প সাহাগঞ্জের ডানলপ কারখানা নিয়ে এরকম একটা সুপরিকল্পিত নাটক হয়েছিলো, কিন্তু মালিক রুইয়া গোষ্ঠী কোন পরিস্থিতিতেই বর্তমান পর্যায়ে কারখানা চালাতে চায় না। সুতরাং অবস্থা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই। কয়েকদিন আগেই শ্রমিক আবাসনের জনৈক শ্রমিক অপুষ্টি ও অবসাদে মারা গেছেন এবং আরও অনেক শ্রমিক এই পরিণতির দিকে ধীরে এগিয়ে চলেছেন। কয়েকদফা কাগুজে হুমকি ছাড়া ডানলপ মালিক পবন রুইয়ার বিরুদ্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা 'মা-মাটি-মানুষ'-এর সরকার এখনও পর্যন্ত নিতে পেরেছেন বা ভবিষ্যতে পারবেন বলে মনে হয় না।

১৯৮০-র দশকে বাম আমলে বেশ কিছু শ্রমিক আত্মহত্যা ঘটেছিল। এর মধ্যে সর্বাগ্রে স্থান পাবেন পাটকলের শ্রমিকরা। স্মৃতি খুঁড়ে বের করে আনা যায় বেশ কিছু ঘটনা। যেমন, জনৈক চটকল শ্রমিক বালি ব্রীজ থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন '৮০-র দশকেই। সে সময় এ সম্পর্কে অনীকে একটি লেখা বেরিয়েছিলো— 'সিদ্ধ মাছ মাথা নাড়ে আর নিহত শ্রমিক কথা বলে' এই শিরোনামে। (সে সময় তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী চীন সফরে গিয়েছিলেন এবং ফিরে এসে বলেছিলেন চীনে নাকি রান্না করা মাছ মাথা নাড়ে।) আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। আগরপাড়ার বিখ্যাত হ্যারিকেন ফ্যাক্টরির (দীপ্তি হ্যারিকেন)

জনৈক শ্রমিক কারখানা বন্ধ থাকার কারণে পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা না করতে পেরে প্রবল অবসাদে আত্মহত্যা করেন। কারখানার অন্য শ্রমিকরা এই ঘটনার প্রতিবাদে আগরপাড়ার রেল লাইন অবরোধ করেন ও বিক্ষোভ দেখান সেই শ্রমিকের মৃতদেহ নিয়ে।

এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হ'ল কিছুদিন আগে। তিনমাস মাইনে না পেয়ে জনৈক ট্রাম শ্রমিক (সিটিসি বাসের ঠিকা ড্রাইভার), বয়সে যিনি নবীন, আত্মহত্যা করলেন। উত্তরবঙ্গের চা বাগানে (রায়মাটাং) না খেতে পেরে অতি সম্প্রতি কয়েকজন শ্রমিক মারা গেছেন। বাম সরকারের আমলেও এই ঘটনা আমরা দেখেছি। আশ্চর্য্যের কথা হচ্ছে চা বাগান শ্রমিকদের অনাহারে মৃত্যু সম্পর্কে বিগত বাম সরকার বয়ানের সাথে 'মা-মাটি-মানুষ'-এর সরকারের অভূতপূর্ব মিল। বাম সরকার বলেছিলো বন্ধ চা বাগান শ্রমিকদের মৃত্যু হয়েছে অপুষ্টিজনিত কারণে। বর্তমান সরকারও তাই বলছে। বাম সরকারও বলত তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে। এরাও তাই বলেন। অর্থাৎ চা শ্রমিকরা চক্রান্ত করে না খেয়ে অপুষ্টিজনিত কারণে মারা যাচ্ছে। অতএব তারা চক্রান্তকারী। প্রশ্ন উঠতে পারে শ্রমিকরা আত্মহত্যা করেন কেন? না খেতে পেয়ে অপুষ্টিতে মারা যায় কেন? কেন তাঁরা বিদ্রোহের পথে যান না, কেন তাঁরা ছিনিয়ে খাবার জন্য কোন যৌথ কর্মসূচিতে সামিল হন না? আশাকরি যারা দিন বদলের সংগ্রামে লিপ্ত আছেন তাঁরা এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজবেন।

গত তিন-চার মাসের কৃষক আত্মহত্যা কৃষি-ব্যবস্থা কৃষি-অর্থনীতি বিষয়ে পুনর্বার দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজনীয়তা সামনে এনেছে। সাম্প্রতিক কৃষক আত্মহত্যাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আত্মহত্যা ঘটেছে বর্ধমান জেলায়। এই জেলাটি আমাদের রাজ্যের শস্যাগার নামে পরিচিত। প্রাথমিক খবর যা পাওয়া যাচ্ছে তাতে অদ্ভুত মিল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ধার নিয়ে কৃষিকাজ করেছিলেন প্রান্তিক কৃষক। উৎপাদিত ফসলের দাম পাচ্ছেন না। সুদে-আসলে ধার আরও বাড়ছে। সুতরাং সম্মানহানি ও অবসাদ জনিত কারণে বেছে নিচ্ছেন আত্মহত্যার পথ। বাম আমলে কৃষক আত্মহত্যা ঘটেনি এমন নয়। ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর তথ্য সেরকমই বলে। বর্তমান সরকারের প্রতিক্রিয়া— 'সাজানো ঘটনা', 'বাম অপশাসনের ফল' ইত্যাদি। প্রান্তিক কৃষকের কৃষিকাজকে লাভজনক অবস্থায় নিয়ে যেতে গেলে করণীয় কী তা নির্ধারণের কোন পদক্ষেপ এখনও নেওয়া হয়নি। অন্যদিকে ইউপিএ-২ সরকার পটাশ ও অন্য কয়েকটি সারের ওপর আবার ৩০ শতাংশ ভর্তুকি হ্রাসের কথা ঘোষণা করেছেন।

অন্যদিকে 'মা-মাটি-মানুষ'-এর সরকারের এই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে আসরে নেমে পড়েছে সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট। সম্প্রতি সিপিএম-এর রাজ্য সম্মেলনের মাধ্যমে বহু ঢাক-ঢোল-কাঁসি বাজিয়ে 'শুদ্ধিকরণ' করা হয়েছে। 'সততা' বিষয়টি কমুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার প্রাক-শর্ত। সেটিকেই এখন একমাত্র শর্ত হিসাবে প্রচার করা হচ্ছে। রাজ্য কমিটি থেকে বাদ পড়েছে কয়েকটি মুখ। কিন্তু ১৯৯০-এর পর নব্য উদারনীতির সাথে তাল মিলিয়ে এ রাজ্যে বাম সরকার যে 'সেজ আইন' লাগু করেছিলো তার সমালোচনা হলো কোথায়? 'আমরা পুঁজিবাদ করছি' দৃপ্ত ঘোষণা যাঁর মুখে শোনা গিয়েছিলো সেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কর্পোরেটদের জন্য জোর করে জমি অধিগ্রহণ বা জমি লুঠ, উচ্ছেদের সমালোচনায় একটা কথাও হয়েছে এমন কোন খবর নেই। রাজারহাটে উচ্ছেদের নায়ক সেই গৌতম দেবকে জেলা সম্পাদক করে আবার মর্যাদার সঙ্গে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। আসলে এসবই করা হচ্ছে করপোরেট হাউসকে, পুঁজিপতিদের এক বার্তা দিতে। সেই বার্তা হচ্ছে, আমরা তোমাদের সাথেই আছি। আমাদের আছে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত সংগঠন। যার মাধ্যমে ২০০৬ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক-কৃষককে সাথে নিয়ে তোমাদের সেবা করে গিয়েছি। ভবিষ্যতেও আমরা সুযোগ পাব সেবা করার। এবং তখন আবার...।

এই পরিস্থিতির মোড় অন্য দিকেও ঘুরতে পারত। প্রবল জন আন্দোলনের জাগরণে ২০০৬-এর পর অভূতপূর্ব পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিলো। দিন বদলের স্বপ্নে ভরপুর বামপন্থীদের সামনে আচমকাই এক সম্ভাবনা এসে গিয়েছিলো। পরিস্থিতি যে এদিকে যাচ্ছে বা যেতে পারে এ সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই ছিলো না। থাকলে অন্তত আঞ্চলিক স্তরেও তাঁরা কোথাও কোথাও প্রাসঙ্গিক হতে পারতেন। আগামী দিনেও দ্রুত পরিস্থিতি বদলাবে। কারণ রাজ্যশাসনে নিছক দলের পরিবর্তনের মাধ্যমে এ রাজ্যের একটি সমস্যারও সমাধান নতুন সরকার করতে পারবেন এমন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

পূর্বালোক পাবলিকেশন-এর বই

পার্টি পঞ্চায়েত ও গ্রাম-রাজনীতি
দয়াবতী রায় ২০০ টাকা

বাঙালী সমাজে ক্ষমতা ও গণতন্ত্র
পার্থসারথি ১৫০ টাকা

Contemporary Politics in West Bengal :
Glimpes from the Left Front Regime
Dayabati Roy &
Parthasarathi Banerjee Rs. 300

প্রাপ্তিস্থান
দে'জ, বই-চিত্র, পিবিএস, Earth Care

যোগাযোগ
purbalokpublication12@gmail.com
9433173954, 9830138558

পশ্চিমবঙ্গে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা : নয় মাসের খতিয়ান

সিদ্ধার্থ গুপ্ত

এ রাজ্যে নতুন সরকার মসনদে অধিষ্ঠিত হবার পর প্রায় ৩০০ দিন অতিক্রান্ত। সরকারের প্রবল সমর্থকরা বলতেই পারেন যে সময়টা কাজের কোনোরকম মূল্যায়নের পক্ষে খুবই অল্প। বিশেষত, ৩৪ বছর ধরে টিকে থাকা বিগত জমানার প্রেক্ষিতে। তা সত্ত্বেও বর্তমান সরকারের মূল্যায়ন করাই যেতে পারে— বিশেষত যেখানে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই একাধিকবার দাবি করেছেন যে তাঁরা এই অল্প সময়েই প্রতিশ্রুত কাজের অধিকাংশই সমাপ্ত করেছেন বা করবার পথে। আলোচনা করা যেতেই পারে গৃহীত নীতি ও পদ্ধতি নিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের মতো নানা সমস্যা জর্জরিত একটি মধ্যম মানের রাজ্যের ক্ষেত্রে সেইসব সমস্যা সমাধানের জন্য কোন পথ অবলম্বন করা হচ্ছে, তা নিয়ে অল্পবিস্তর চর্চা করলে আশাকরি নতুন সরকারের প্রতি অবিচার করা হবে না। বিস্তৃত রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের পর্যালোচনা এ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নয়— প্রাবন্ধিকের ক্ষমতারও বাইরে। আমি আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব সরকারি স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে। তথ্যসূত্র— সংবাদমাধ্যমের নানা প্রতিবেদন; সরকারি বেশ কিছু বিজ্ঞপ্তি, দলিল-দস্তাবেজ; স্বাস্থ্যদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.wbhealth.gov.in) এ প্রকাশিত নানা নথি এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন এমন নানা প্রাবন্ধিকের রচনা। বর্তমান সরকারের কর্মসূচির বিষয়ে বারে বারে আসবে বিগত সরকারের কৃত বা অ-কৃত কর্মের খতিয়ান, তার সাফল্য ও ব্যর্থতা। কেবল একটাই অনুরোধ *'অনীক'*-এর ঋদ্ধ পাঠকদের প্রতি। বর্তমানে রাজনৈতিক উতোর-চাপান যে উচ্চগ্রামে উঠেছে (বিশেষত শিশুমৃত্যু, আমরির অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে) তাতে আমার মূল্যায়ন বর্তমান সরকারের 'দালালি' বা বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে 'চক্রান্ত' এই দুটির কোনোটি হিসেবেই বিবেচনা না করলে বাধিত হব। যুযুধান দুই পক্ষ। একপক্ষে আছেন 'মা-মাটি-মানুষের' সরকারের প্রবল সমর্থকবৃন্দ, যাঁদের কাছে বিন্দুমাত্র সমালোচনাই অনভিপ্রেত এবং চক্রান্তমূলক। অন্যপক্ষে রয়েছেন 'রজ্জুতে সর্পভ্রম' করা জোট সরকারের প্রতি খড়গহস্ত সমালোচকের দল, যাঁদের কাছে নতুন সরকারের প্রতিটি কাজই প্রতারণাপূর্ণ। আমরা যারা 'ঘরেও নহে, পারেও নহে' তাদের কাছে প্রাণ খুলে সাহসভরে দুটি মতামত জানাবার আঙ্গিনা *'অনীক'*।

নির্বাচনী ইস্তেহার

দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক তৃণমূল কংগ্রেসের বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে পেশ করা বাঙলা ও ইংরাজি ইস্তাহারে। দুটিতে কিছু পাঠ্যান্তর আছে, যা অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। ইংরাজি নথিটি সঠিক অর্থে নির্বাচনী ইস্তেহারও নয়, তা হলো 'Vision Document'। আমরা দেখে নেব বর্তমান শাসকদল নির্বাচনের পূর্বে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মোটের উপর কী কী কর্মসূচির আশ্বাস দিয়েছিল।

"গড়া হবে স্বাস্থ্যব্যবস্থা। যত দিন যাচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে চিকিৎসা পরিকাঠামো। এ রাজ্যের সাধারণ মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন না। দরিদ্রতম মানুষের কাছেও জীবনদায়ী চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়া আমাদের লক্ষ্য। আমাদের অভিযান **সকলের জনস্বাস্থ্য**।"

এই বলিষ্ঠ ঘোষণার প্রেক্ষিতে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় যেসব পদক্ষেপের কথা বলেছিল তার ইস্তেহারে, তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ—

- চিকিৎসা কেন্দ্রগুলির জনস্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে জরুরি ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞ পরিষদ গঠন;
- জেলায় জেলায় ব্লক-ভিত্তিক স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে পরামর্শ ও তদারকির জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দল গঠন;
- এনআরএইচএ (বোধহয় এনআরএইচএম বা ন্যাশনাল রুরাল হেলথ মিশন হবে) খাতে বিনিয়োগে মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য সচেষ্ট হওয়া (এই প্রতিশ্রুতিটির অর্থ আমার কাছে অবোধ্য -লেখক);
- অনুন্নত শ্রেণীর মানুষদের জন্য হাসপাতালে শয্যা সংরক্ষণ;
- উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো ও পরিষেবার উন্নতি;
- স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক ও কর্মচারীদের দায়বদ্ধতা নির্ধারণ ও মূল্যায়ণ;
- সারা রাজ্যে গ্রামীণ হেলথ কার্ড ও প্রত্যেক মহকুমায় আইসিইউ চালু করা;
- দ্রুত ১০টি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা।

এছাড়া তৃণমূল স্বাস্থ্য পরিষেবা যোজনায় বলা হয়েছিল—

- গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকেও গুরুত্ব দেওয়া;
- সদর সহ উপ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কুকুর ও সাপে কামড়ানোর ঔষধ সহ বিভিন্ন জীবনদায়ী ঔষধ সরবরাহের জন্য অর্থ সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মজুত রাখা;
- সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও হাসপাতালে যন্ত্রপাতি চালানোর লোক নিয়োগ করা, প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং যন্ত্র খারাপ হলে দ্রুত সারানোর ব্যবস্থা করা;
- সর্বোপরি, সব স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালে পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা, চিকিৎসা পরিষেবা প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয়গুলির দায়ভার নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা কমিটির উপর বর্তাবে (এই উক্তিটিও ঠিক বোধগম্য হয় নি-লেখক);

বলা হয়েছিল পূর্ববর্তী সরকার স্বাস্থ্যক্ষেত্রের অবস্থা অতি দুর্বল

করে দিয়েছে। সর্বস্তরে পরিষেবার মান খুবই খারাপ। মা-মাটি-মানুষের সরকারের প্রতিশ্রুতি যে ৫ বছরেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের হাল ফিরবে। ডাক্তার ও নার্সদের বাড়ি যে ব্লকে সেখানেই নিয়োগ করা হবে। কাজে অবহেলা করলে সরকার নাগরিকদের জানিয়ে কঠোর শাস্তি দেবে।

ইংরাজি নথিটিতে রাজ্যে হাসপাতাল, শয্যা, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যার নিরিখে গভীর সঙ্কটের কথা বলা হয়। বিশেষত গ্রামীণ এলাকাগুলিতে। উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চূড়ান্ত ঘাটতির কথা বলা হয়। নতুন সরকার এই ঘাটতি পূরণের এবং পরিষেবার মান উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হবে। প্রতি মহকুমায় অন্তত একটি বহুমুখী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসার হাসপাতাল তৈরি করা হবে। এছাড়াও আগামী তিন বছরে ১৫টি মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে ঐ নথিতে।

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার প্রথম ২০০ দিনের মধ্যে স্বাস্থ্যক্ষেত্র কী কী করা হবে—

প্রথমেই বলা হয়েছে যে, কলকাতা ছাড়া রাজ্যের সর্বত্র স্বাস্থ্য পরিষেবার অবস্থা ভয়ানক। ৭২ শতাংশ মানুষ গ্রামবাসী, অথচ ২৫ শতাংশেরও কম সরকারি হাসপাতাল গ্রামে রয়েছে। সরকার চেষ্টা করবে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল পর্যন্ত চারটি স্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে ঢেলে সাজাতে। এজন্য বেসরকারি বিনিয়োগকেও আকর্ষণ করা হবে। গরীব মানুষদের জন্য ক্ষুদ্র স্বাস্থ্য বীমা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

'হাব ও স্পোক' মডেলের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও মহকুমার হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল হয়ে তৃতীয় বা চতুর্থ স্তরের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসার হাসপাতালের সাথে সংযুক্ত থাকবে।

সংক্ষেপে এই হল পশ্চিমবাংলার সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিবর্তন ও উন্নয়নের রূপরেখা।

নির্বাচনের পর

বিপুল জনাদেশ নিয়ে মে মাসের ১৭ তারিখে তৃণমূল কংগ্রেস-জোট সরকার মসনদে বসলেন। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং স্বাস্থ্য দপ্তরের ভার নেওয়া অবশ্যই এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকী বিষয়— কেননা, পশ্চিমবঙ্গে তো নয়ই, ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যেও এমন ঘটনা বিশেষ ঘটেনি। সূর্যকান্তবাবু তাঁর মন্ত্রীত্ব জীবনের দীর্ঘ সময়ে পঞ্চায়েতের মত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের সাথে, 'দুয়োরানী' স্বাস্থ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে পারেন নি। আজ অবশ্য তিনি দাবি করেছেন পূর্ণ সময়ের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর জন্য। আসলে মন্ত্রীত্বের গুরুত্বের বিচারে স্বরাষ্ট্র, অর্থ, শিল্প, কৃষি, শ্রম, পঞ্চায়েত, শিক্ষা, নগরোন্নয়ন, পরিবহন, পূর্ত এমনকি ক্রীড়ারও পরে বরাবর স্বাস্থ্যের স্থান ছিল বিগত জমানায়। বামফ্রন্টের কাছে মন্ত্রক হিসাবে স্বাস্থ্যের গুরুত্ব কিছুটা বাড়ল— যখন নব্বই-এর দশকের শেষভাগ থেকে কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসের নামে বিশ্বব্যাঙ্ক, ডিএফআইডি, কেএফডব্লু প্রভৃতি ঋণদাতা সংস্থার কোটি কোটি টাকা ঢুকতে আরম্ভ করল স্বাস্থ্যক্ষেত্রে। তারপর ২০০৫ সালে এলো জাতীয় স্বাস্থ্যমিশনের বিপুল অর্থ। স্বাস্থ্যের পরিষেবাভিত্তিক খোলনলচে বদলে তাকে পুরোপুরি একটা বাজারি পণ্যে পরিণত করার উদ্যোগ চালু হল পুরোদমে। রাজ্য সরকার ম্যাকিন্‌সে-র পরামর্শে মুম্বাই-বেঙ্গালুরুর সাথে পাল্লা দিয়ে "স্বাস্থ্য পর্যটন" (Health Tourism), প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ ও সরকারি হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগের নামে ব্যবসা করে দু'পয়সা কামিয়ে নেবার দিবাস্বপ্নে মশগুল হয়ে পড়লেন। বলা যায় তখন থেকেই ভিখারিণী সিন্ডারেলার (অর্থাৎ স্বাস্থ্যের) কপাল ফিরল! এই কারণ অবশ্য তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত নতুন সরকারের ক্ষেত্রেও সত্য। একদিকে স্বাস্থ্যের বিপুল বাণিজ্যিক সম্ভাবনা, অন্যদিকে ভেঙ্গে পড়া সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার কিছুটা মানোন্নয়ন ভোটব্যাংককে কিছুটা সুদৃঢ় করবে এই বিশ্বাস।

গত ৩৪ বছরে উন্নত আরো উন্নত আরও আরও উন্নত, এহেন সাতটি বামফ্রন্টের আমলে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল কী দাঁড়িয়েছিল তা বিস্তারিত আলোচনা করে এ প্রবন্ধকে ভারাক্রান্ত করতে চাই না। এককথায় "গুণতে গেলে গুণের নাহি শেষ!" একদিকে চূড়ান্ত অপদার্থতা, অমানবিকতা, পর্বতপ্রমাণ দুর্নীতি ও দলতন্ত্র। অন্যদিকে 'উন্নত পরিষেবার' নাম করে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতাল প্রায় বিনা পয়সায় বেসরকারি বেওসায়ীদের হস্তান্তর (প্রকৃষ্টতম উদাহরণ ঢাকুরিয়ার অধুনা হত্যাপুরী 'আমরি' হাসপাতাল বা যাদবপুরে যক্ষ্মা হাসপাতালের চত্বরে গড়ে ওঠা কেপিসি মেডিক্যাল কলেজ), কোথাও পিপিপি বা যৌথ উদ্যোগের নামে বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীদের সাথে বখরার কারবার ফাঁদা, কোথাও বা নামমাত্র মূল্যে সরকারি জমি প্রাইভেট হাসপাতাল করতে তুলে দেওয়া— সেখানে গরিব রোগীদের চিকিৎসা হবে এই অজুহাতে। অন্যদিকে সরকারি হাসপাতালগুলির ক্রমশ নরকে পরিণত হওয়া, জঞ্জালের স্তূপে ঢাকা পড়ে যাওয়া, বিনা চিকিৎসায়, কুচিকিৎসায় পোকামাকড়ের মতো রোগীর বা রোগিণীর মৃত্যু, চিকিৎসক থেকে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী পর্যন্ত এক প্রধান অংশের অমানবিক আচরণ ও হাসপাতালকে নানাধরনের ব্যক্তিগত মুনাফার কেন্দ্র করে তোলা, কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা এবং 'পার্টির' রক্তচক্ষুর সামনে অসহায়তা, চিকিৎসক ও কর্মীদের পদোন্নতি বা বদলিতে পার্টির সর্বময় কর্তৃত্ব এবং ন্যূনতম নিয়মনীতির বালাই না থাকা, আর মাঝে মাঝে হাসপাতালে সংঘর্ষ ও ভাঙচুর— এই ছিল বাম জমানায় প্রতিটি হাসপাতালের রোজনামচা। একান্ত অসহায় মানুষ ছাড়া কেউ সেসব হাসপাতালে যেতেন না। যাঁরা যেতেন তাঁদেরও চুষে নেবার জন্য রাজনৈতিক মদতপুষ্ট দালালচক্র সদা সক্রিয়। পাশাপাশি সরকারও অতি সক্রিয় জমি, জল, বিদ্যুৎ, করছাড়ের ভর্তুকি দিয়ে রং-বেরং-এর বেসরকারি হাসপাতাল তৈরিতে সুবাতাস জোগাতে। অতি সংক্ষেপে এই ছিল বিগত জমানার স্বাস্থ্যব্যবস্থার চালচিত্র। অসংখ্য পরিসংখ্যান, তথ্য ও উদ্ধৃতি দেওয়া যায় এই বক্তব্যের সমর্থনে। শিশু ও মহিলাদের মধ্যে অপুষ্টি ও রক্তাল্পতা, জন্মের সময় কম ওজন ও খর্বতা,

কম বিএমআই— এইসব কিছুর নিরিখেই ভারতবর্ষের প্রধান রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান তলার দিক থেকে তিন, পাঁচ বা সাতে। (সূত্র : পশ্চিমবঙ্গ মানব উন্নয়ন সূচক, ২০০৪) বাম জমানার শেষে এ রাজ্যে লক্ষ্যমাত্রার থেকে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র কম ছিল ১৭৪৫টি (৮৬ শতাংশ), স্বাস্থ্যকেন্দ্র ১০৬৯টি (৫৪ শতাংশ), কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ১৪৯টি (৩০ শতাংশ)। পুরুষ ও মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীর মোট ঘাটতি ছিল ১১৩৭০ জন (প্রায় ৪৮ শতাংশ)। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ঘাটতি ছিল প্রায় ৮৩ শতাংশ, নানা ধরনের টেকনিশিয়ানের ৮৪ শতাংশ। (সূত্র : রুরাল হেল্‌থ বুলেটিন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, ভারত সরকার)

প্রবন্ধকে অতিরিক্তি তথ্য ভারাক্রান্ত করতে না চাইলেও, নিতান্ত নাচার হয়ে আরও দু-একটি তথ্যের উল্লেখ করতে হচ্ছে। বিগত সরকার জন্মহার, মৃত্যুহার এবং শিশুমৃত্যুর হারে পশ্চিমবঙ্গের সাফল্যের কথা বহুবার বুক বাজিয়ে বলেছেন। কিন্তু এইসব পরিসংখ্যান যে কেরালা, তামিলনাড়ু বা মহারাষ্ট্রের চেয়ে অনেক পিছনে সেই গুরুতর তথ্যটি বিস্মৃত হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, কেরালায় শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১২, পশ্চিমবঙ্গে ৩২। দ্বিতীয়ত, সারা দেশে শিশুদের ধনুষ্টংকার ও হামজ্বরে আমরাই সবার উপরে। জন্ডিস এবং ফুসফুস সংক্রমণেও আমরা প্রথম। দেশের ৪০ শতাংশ হামজ্বর, ২১ শতাংশ ধনুষ্টংকার ও ১৭ শতাংশ ডিপথেরিয়া রোগী সরবরাহ করি আমরা। তৃতীয়ত, এখনও এরাজ্যে ৪৮ শতাংশ প্রসূতির সন্তান হয় বাড়িতে, কোনো প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীর সাহায্য ছাড়াই। চতুর্থত, রোগীদের ব্যক্তিগত খরচ বা যাকে বলে out of pocket expenditure— তার জাতীয় গড় ৭৭ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে তা ৮৫ শতাংশ। এবং সর্বশেষে বলি, ২০০৭ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে জাতীয় স্বাস্থ্যমিশনের বরাদ্দ ৬৬২.১ কোটি খরচ করতে পারেননি বিগত সরকার।

বিগত জমানায় সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কী হাল হয়েছিল তা রাজ্যের লোক হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন। তাই মুখ্যমন্ত্রী যখন স্বয়ং স্বাস্থ্যমন্ত্রকের ভার নিলেন এবং মসনদ বসার সাত দিনের মধ্যেই বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে হানা দিয়ে পরিষেবা এবং পরিকাঠামো যাচাই করতে আরম্ভ করলেন, তখন আম-জনতার মধ্যে আশার সঞ্চার হল যে এবার কিছু একটা হবে। প্রথমেই বাঙ্গুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরোলজির অধ্যক্ষ সাসপেনশনের আওতায় পড়লেন উদ্ধত আচরণের অভিযোগে। এরপর বাঘাযতীন, এসএসকেএম, আরজিকর, কলকাতা পুলিশ হাসপাতালে কিছু স্বাস্থ্যকর্তাকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চলল। সরকারি চিকিৎসক এবং আধিকারিকদের মধ্যে একটা সন্ত্রস্তভাবও সৃষ্টি হল। দুচার দিন বহির্বিভাগ সঠিক সময়ে খুলতে লাগল। চিকিৎসকরা অন্দরবিভাগে তিনবার করে রাউন্ড দিয়ে রোগীর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলতে লাগলেন। কিন্তু সেই সবই ক্ষণস্থায়ী।

তৃণমূল কংগ্রেস সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক একটি দল। শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তাই এই দলের সম্পদ। দুর্বলতার উৎসও সেটাই। মমতা জানেন, প্রশাসনের সর্বস্তরে জালের মতো ছড়িয়ে থাকা সিপিএম-এর সংগঠনের মতো সংগঠন তাঁর নেই, কোনোদিন হওয়া সম্ভবও নয়। তাই অন্যান্য ক্ষেত্রের মত স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও তিনি মূলত দুটি নীতি অবলম্বন করলেন—

১। দল বা প্রশাসনকে বাদ দিয়ে সরাসরি মানুষের সাথে জনসংযোগ (যার মধ্যে এই হাসপাতাল পরিদর্শন পড়ে)।

২। ধিকৃত বিগত জমানার দুচারজনকে বাদ দিয়ে (যেমন : বিপুল দুর্নীতিতে অভিযুক্ত প্রাক্তন স্বাস্থ্যসচিব) প্রায় সকল স্বাস্থ্য অধিকর্তা বা আধিকারিককে স্বপদে বহাল রাখা, শর্ত কেবল আনুগত্যের পরিবর্তন, যা করতে বিগত জমানার এইসব আমলারা একান্ত উদগ্রীব হয়ে ছিলেন। ফলে প্রশাসনিক কাঠামো প্রায় একই রয়ে গেল। তেমন ঘুণধরা, তেমনই দুর্নীতিগ্রস্ত।

প্রথম গৃহীত নীতিটির ফলে, (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জনসংযোগ এবং দ্রুত সব সমস্যা সমাধান করে ফেলার প্রতিশ্রুতি) মানুষের প্রত্যাশার পারদ উর্ধ্বগামী হল। স্বাস্থ্য পরিষেবার সমস্যাগুলির উৎস গভীরে। চটজলদি সমাধান আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু সবই দ্রুত সমাধান করে দেওয়া হবে— এই কথা বারবার ঘোষণা করার পর, কোনো সরকারি হাসপাতালে শিশুমৃত্যু ঘটলে, বিনা চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যু হলে, হাসপাতাল থেকে প্রত্যাখ্যাত রোগিনীর রাস্তায় প্রসব হলে বা প্রসূতির পরিচর্যায় জীবাণুনাশকের পরিবর্তে কার্বলিক অ্যাসিড ব্যবহৃত হলে, মানুষের তীব্র ক্ষোভ জেগে উঠছে ''তাহলে আর পরিবর্তন কী হল? সবই তো আগের মতোই আছে!'' আসলে নয়মাসে প্রায় সবই আগের মতো থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যে বলে দিয়েছেন, প্রায় সব কাজই সমাপ্ত। তাহলে এমন হবে কেন? এটাই মানুষের প্রশ্ন। 'সব করে ফেলেছি', বারংবার এই ঘোষণাই এর জন্য দায়ী।

বিগত জমানার আমলাদের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা এই সরকারের একটি প্রধান দুর্বলতা হিসাবে অচিরেই প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমার বিশ্বাস। পরিবর্তনের পর এঁরা কিছুদিন ঘাপটি মেরে বসে ছিলেন, জল মাপছিলেন। এখন বুকে বল ফিরে পেয়েছেন যে এঁদের ছাড়া নতুন সরকারেরও চলবে না। সিপিএম জমানার জনবিরোধী গৃহীত স্বাস্থ্যনীতিই এঁরা নতুন মোড়কে পরিবেশন করতে আরম্ভ করেছেন— সেই বেসরকারি কর্পোরেট হাসপাতালের সঙ্গে গাঁটছড়া বাধা, সেই বিশল্যকরণী পি-পি-পি মডেল। অমর্ত্য সেন সহ বহু প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ বলেছেন ''স্বাস্থ্য মূলত রাজনৈতিক বিষয়।'' বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার আলমা আটা ঘোষণায় পরিষ্কার বলা হয়েছিল, ''সকলের জন্য স্বাস্থ্য কর্মসূচির সাফল্য নির্ভর করছে রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা ও সদিচ্ছার উপর।'' মনে হচ্ছে রাজ্য সরকারের সেই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বাদ দিয়ে প্রশাসনিক আমলানির্ভর সিদ্ধান্তের উপর অতিরিক্ত ভরসা রাখা আত্মঘাতী হয়ে পড়বে।

নতুন ঘোষিত কর্মসূচি

নানা কর্মসূচি ঘোষিত হতে লাগল। ঘোষণা করা হল ব্যয় বরাদ্দেরও। সংক্ষেপে তা সূত্রাকারে নথিবদ্ধ করার চেষ্টা করা যাক।

১। পরিষেবার উন্নতির জন্য পশ্চাদপদ এলাকায় তামিলনাড়ু মডেলে গড়ে তোলা হবে সাতটি স্বাস্থ্য জেলা। স্বাস্থ্য জেলাগুলি হল ডায়মন্ডহারবার, বসিরহাট, ঝাড়গ্রাম, আসানসোল, রামপুরহাট, নন্দীগ্রাম ও বিষ্ণুপুর। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে স্বাস্থ্যপরিষেবার উন্নতির জন্য "পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা" বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত বলি, এই ৫০ হাজার কোটি টাকা এক অবাস্তব ঘোষণা— যা সারা ভারতের স্বাস্থ্য বাজেটের চেয়ে বেশি। এই বিপুল পরিমাণ টাকা কোথা থেকে আসবে? কোন্ খাতে? তারা কোনো বিবরণ আদৌ নেই।

২। অনগ্রসর এলাকার চিকিৎসক পাঠানোর জন্য পুরস্কার হিসাবে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এইসব চিকিৎসকের জন্য আসন সংরক্ষণ ও ৩০% বেশি নম্বর দেওয়া। ইন্টার্নশিপের ১ বছর বাধ্যতামূলকভাবে গ্রামে কাজ করানোর প্রস্তাব চিন্তাভাবনা (কেরালা বা তামিলনাড়ুর অনুসারে)। প্রয়োজনে ভিনরাজ্য থেকে চিকিৎসক নিয়োগ।

৩। অনগ্রসর ১১টি জেলায় ৩৪টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তোলা (বাজেট দুহাজার কোটি টাকা)। বাকি ৯টি জেলাতেও স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন নিজের টাকায় করবে রাজ্য সরকার। পরবর্তীকালে আরও জানা গেল যে কেন্দ্রীয় সরকারের মঞ্জুর করা পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল (BRJF) থেকে ঐ টাকা পাওয়া যাবে। জেলা হাসপাতালের অব্যবহৃত জমিতে আট থেকে দশতলা বাড়ি বানিয়ে দেবে রাজ্য সরকার। প্রতিটিতে প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার বর্গফুট জায়গা। আনুমানিক খরচ ৪৮ থেকে ৫০ কোটি টাকা। এরপর ঐ বাড়িগুলি BOT মডেলে (Build-Operate-Transfer) হস্তান্তর করা হবে নানা বেসরকারি হাসপাতালের হাতে— যারা পি-পি-পি মডেলে পরিষেবা যোগাবে। এর মধ্যেই রাজ্য স্বাস্থ্য পরিষেবা নিগম (West Bengal Medical Service Corporation)-এর পক্ষ থেকে এ বিষয়ে প্রস্তাব আহবান করে 'Concept Paper' প্রচার করা হয়েছে। এ বিষয়ে আরও আলোচনা পরে করছি। শোনা যাচ্ছে যে ইতিমধ্যেই নাকি ডাঃ দেবী শেঠীর মালিকানাধীন আরএনটেগোর গ্রুপের সঙ্গে সমঝোতাপত্র (MOU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৪। জঙ্গলমহলে ১১টি ব্লকে মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট ও সুন্দরবন অঞ্চলে মোবাইল পরিষেবা শুরু করার কথা ছিল ১ জানুয়ারি থেকে।

৫। কলকাতা শহরেও পি-পি-পি মডেলে রামরিখদাস হরলালকা, নর্থ সুবার্বান বা ইন্দিরা মাতৃসদনের মতো 'রুগ্ন' সরকারি হাসপাতালকে দরপত্র ডেকে হস্তান্তর করা হবে বেসরকারি সংস্থাকে। সরকার কত শতাংশ বখরা পাচ্ছেন সেটাই নির্বাচনের শর্ত। যেসব গরীব রোগির ঐসব হাসপাতালে চিকিৎসা হবে, তাদের খরচ সরকার ঐ বখরার টাকা থেকে মিটিয়ে দেবেন।

৬। মেডিক্যাল কলেজগুলিতে সুলভ মূল্যে ঔষধ ও যন্ত্রপাতি বিক্রির জন্য গড়ে তোলা হবে 'ফেয়ার প্রাইস শপ'।

৭। বন্ধ করা হবে যথেচ্ছ রেফারেল (referral)। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী গ্রাম বা মফস্বল থেকে শহরের হাসপাতালে এই অপ্রয়োজনীয় রেফারেলকেই হাসপাতালে শিশুমৃত্যুর এক প্রধান কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন। হাসপাতালে পরিচ্ছন্নতার উপর, গজ-তুলো প্রভৃতির নিয়মিত সরবরাহের উপর জোর দেওয়া হবে।

৮। বরদাস্ত করা হবে না রোগি ফেরানো, চিকিৎসায় গাফিলতি এবং ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মীদের অমানবিক আচরণ।

৯। কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।

১০। গত আট মাস ধরে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে (জেলা হাসপাতালগুলি সহ) লাগাতার শিশুমৃত্যুর ঘটনা রাজ্য রাজনীতিকে আলোড়িত করেছে। সরকারি ভাষ্য হল এর জন্য মূলত দায়ী বামফ্রন্ট আমলে আদৌ পরিকাঠামো গড়ে না তোলা। ৩২টি প্রস্তাবিত বিশেষ শিশু চিকিৎসা কেন্দ্রের মধ্যে (SNCU) মাত্র ছটি বর্তমান ছিল। নতুন সরকার ছয় মাসের মধ্যে আরও ছয়টি এমন কেন্দ্র গড়ে তুলে তুলেছেন। আগামী বছরের মধ্যে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় গড়ে উঠবে মোট ৪০টি কেন্দ্র। এছাড়াও ডাঃ ত্রিদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সভাপতিত্বে গড়া হয়েছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন 'টাস্ক ফোর্স'।

সংক্ষেপে এগুলিই হল বিগত নয় মাসে সরকারের তরফে ঘোষিত নীতি ও গৃহীত পদক্ষেপ।

ঘোষণা বনাম বাস্তব

লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো এই যে গত নয় মাসে যেসব কর্মসূচি ঘোষিত হয়েছে তার অধিকাংশই দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের চিকিৎসা পরিষেবা (Secondary and Tertiary care) সংক্রান্ত। সরকারি উদ্যোগের কেন্দ্রে রয়েছে এসএনসিইউ (SNCU) বা এনআইসিইউ (NICU) গড়ে তোলা, জেলায় জেলায় বেসরকারি সহযোগিতায় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তোলা ইত্যাদি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে চূড়ান্ত অ-স্বাস্থ্যের মূলে রয়েছে অত্যন্ত দুর্বল প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা। উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী বা এএনএম (Auxillary Nurse and Midwives)-এর তীব্র অভাব। সরকারি হাসপাতালে মাথাপিছু শয্যার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দেশের মধ্যে তলার দিকে। বর্তমান সরকার দাবি করেছেন যে গত সাত মাসে ১২০০ কোটি টাকা (কোথা থেকে এলো?) খরচ করে রাজ্যে ৩৫০০ শয্যা বাড়ানো হয়েছে। এ দাবি সম্পূর্ণ অসার বলেই মনে হচ্ছে। ৩০০ জন শিক্ষক চিকিৎসক, ২৩২ জন সাধারণ চিকিৎসক, ৩৭ জন বিশেষজ্ঞ, এবং ২৮০ জন এএনএম নিয়োগ করা হয়েছে। ৬০০ জন অবসরপ্রাপ্ত

সেবিকাকে পুনর্নিয়োগ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ লোক নিযুক্তি আয়োগ (Public Service Commission) এর দীর্ঘসূত্রতা কাটাতে আলাদা একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে দ্রুত নিয়োগের জন্য।

এইসব দাবি পুরোপুরি সঠিক কিনা জানা নেই। তবে এখনও বহু পদ ফাঁকা পড়ে আছে। বিশেযত তীব্র ঘাটতি প্রশিক্ষিত সেবিকার ক্ষেত্রে। সরকারি চাকরিতে যোগ দিতে ইচ্ছুক অনেক তরুণ চিকিৎসকেরই বক্তব্য, তারা চাকরির জন্য সাক্ষাৎকার দিয়েও ডাক পান নি। এনআইসিইউ-গুলি চালু করা হয়েছে নানা আধুনিক যন্ত্রপাতি সহ। এজন্য গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের টাকা বরাদ্দই ছিল যা পূর্বতন সরকার অপদার্থতার জন্য খরচ করতে পারে নি। ছ'টি এনআইসিইউ চালু করার অবশ্যই বর্তমান সরকারের কতিত্ব। কিন্তু ওয়াকিবহাল মহলের কথায়, শিশু চিকিৎসকের ব্যবস্থা হলেও প্রশিক্ষিত সেবিকা ও অন্যান্য কর্মী অনেক কম। ফলে সব ক'টি শয্যায় পরিষেবা আদৌ চালু করা যায়নি। এ ঘাটতি কিভাবে পুরণ হবে তার দীর্ঘমেয়াদি কোনো পরিকল্পনা এখনও করা হয় নি। অন্য রাজ্য থেকে চিকিৎসক নিয়োগের কথা সম্ভবত দুরাশা, কারণ পার্শ্ববর্তী কোন রাজ্যেই চিকিৎসক উদ্বৃত্ত নেই। তাছাড়া স্থানীয় ভাষার সমস্যা রয়েছে। আর বিশেযজ্ঞ চিকিৎসকের অভাবের একটি প্রধান কারণ হল দীর্ঘদিন ধরে স্নাতকোত্তর স্তরে আসন বৃদ্ধি না হওয়া। তাছাড়া যারা উত্তীর্ণ হয়ে বের হচ্ছেন, তাদের প্রবণতা বেসরকারি কর্পোরেট হাসপাতালের উচ্চ বেতনের চাকরি ও প্র্যাকটিসের দিকে। আর বাধ্যতামূলকভাবে গ্রামে কাজ করাবার আইনি বাধা তো আছেই। উল্টোদিকে গত সাত মাসে একশোরও বেশি সরকারি চিকিৎসক স্বেচ্ছা-অবসর গ্রহণের আবেদন করেছেন। গ্রামীণ বা মহকুমা হাসপাতালের বিপুল কাজের চাপের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শাসক দলের স্থানীয় কর্মীদের সময়ে অসময়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে দলবদ্ধভাবে আগমন এবং 'অমুকদা', 'অমুকবাবু'র নাম করে 'সুচিকিৎসা'র জন্য হুমকি। উত্তর ২৪ পরগণার একটি হাসপাতালে স্থানীয় বিধায়ক ও মন্ত্রীর স্নেহভাজন কর্মীরা প্রতিদিনই আসেন এবং অধ্যক্ষকে নানা নির্দেশ দেন বলে প্রকাশ। এ ধরনের ঘটনা জেলা ও মহকুমার দিকে অনেক বেশি।

শারীরিক নিগ্রহের আশঙ্কার নামে যুক্ত হয়েছে কর্তৃপক্ষের তরফে ভর্ৎসনা ও শাস্তির সতর্কীকরণ। বিগত জমানাতেও এসব সমস্যা ছিল। কিন্তু দীর্ঘদিনের অভ্যাসের ফলে 'আদান-প্রদানে'র একটি ব্যবস্থা বা System গড়ে ওঠে। পুরানো ব্যবস্থার বদলে নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসকদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। অত্যন্ত ঢাকঢোল পিটিয়ে চালু করা হয়েছিল 'Outdoor Tracking System'— যাতে ঠিক নয়টায় সমস্ত হাসপাতালের বহির্বিভাগ চালু হয়ে যায়। প্রতিটি হাসপাতালের সুপারকে ফোন করে বা এসএমএস (SMS) পাঠিয়ে স্বাস্থ্যভবনে প্রতিদিন জানাতে হবে বহির্বিভাগ চালু হবার কথা। এসএমএস নিয়মিতই আসছে, কিন্তু বিভাগ চালু হচ্ছে না। স্বয়ং স্বাস্থ্যসচিব ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে দেখেছেন বার্তা আসার এক ঘন্টা পরেও আউটডোর চালু হয় নি। অনগ্রসর অঞ্চলে কাজ করলে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অতিরিক্ত সুবিধা দেবার সরকারি নীতি হাইকোর্টের এক রায়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে— প্রধান কারণ অনগ্রসর এলাকা বাছার ক্ষেত্রে বৈষম্য। কলকাতার মধ্যে বাঘাযতীন বা দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাঙ্গুর হাসপাতাল অনগ্রসরের তক্‌মা পেয়েছে, কিন্তু পুরুলিয়া বা সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামীণ হাসপাতাল নয়। ফলে ৩০ জন চিকিৎসক মামলা করে আদালত থেকে স্থগিতাদেশ পেয়ে গেছেন। কেন এই বৈষম্য? মনে হচ্ছে গত জমানার সর্যের মধ্যে যেসব ক্ষমতাশালী ভূতেরা ছিলেন, এই জমানাতেও পুনর্বাসন পেয়ে তাঁরাই ভাই-ভাতিজাদের জন্য বাঙ্গুর বা বাঘাযতীন হাসপাতালকে 'অনগ্রসর' বলে চিহ্নিত করে রেখেছেন।

স্বাস্থ্য জেলার বিষয়ে তীব্র মতবিরোধ শুরু হয়েছে। এটি মূলত বিশ্বব্যাঙ্ক নির্দেশিত কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস (SAP)-র একটি প্রক্রিয়া। সরকারি অনেক আধিকারিকের মত হলো এর ফলে সাতজন সিএমওএইচ সহ আরও প্রায় পঞ্চাশটি নতুন পদ সৃষ্টি হবে এবং তাদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাবাবদ ব্যয়ভার আরও বাড়বে। কিন্তু পরিকাঠামোর উন্নতি হবে না। বরং ঐ অর্থ উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা গ্রামীণ হাসপাতালের যে বিপুল ঘাটতি রয়েছে (পূর্বে উল্লিখিত) তা পুরণ করতে কাজে লাগালে ভালো হত। সেইসব স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ বা স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের কথা কিন্তু বিগত নয়মাসে একবারও বলা হয় নি। কবে এই ঘাটতি থাকা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি গড়ে উঠবে তার কোনো উল্লেখ গত নয় মাসে কোনো ঘোষণায় আমরা পাইনি।

হাসপাতালে শিশুমৃত্যু প্রসঙ্গ

এবার আসি হাসপাতালে শিশুমৃত্যুর প্রসঙ্গে। শিশুমৃত্যুর জন্য যে শিশু ও মায়েদের অপুষ্টি, রক্তাল্পতা, কম ওজনের শিশু জন্মানো, গ্রাম মহকুমা ও জেলাস্তরে বিগত সরকারের সময়ে সঠিক পরিকাঠামো গড়ে না ওঠা, প্রস্তাবিত এনএসসিইউ তৈরি করতে না পারা দায়ী— সে প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারের বক্তব্য সঠিক বলে আমার ধারণা। এই ধরনের শিশুমৃত্যু বিগত জমানাতেও বহুবার ঘটেছে। ২০০২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতার বিসিরায় হাসপাতালে ৪৮ ঘণ্টায় ৩০টি শিশুর মৃত্যু হলে তদানীন্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী (বর্তমানে বিরোধী দলনেতা) সাংবাদিক সম্মেলনে ঔদ্ধত্যের সাথে বলেন, "এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এমন ঘটনা আরও অনেক ঘটবে।" এই নিয়ে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হলে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে সমর্থন করে বলেন, "সূর্য (কান্ত) আমার মন্ত্রীসভার সম্পদ।" বোধকরি সেসব তারা সুবিধাজনকভাবে বিস্মৃত হয়েছেন। আমার ধারণা বর্তমান শিশুমৃত্যুর জন্য মূলত দায়ী বিগত ৩৪ বছরের বামশাসন— তার ভেঙ্গে পড়া অর্থনীতি, চূড়ান্ত অপুষ্টি, সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণে প্রায় কিছুই না করা, সরকারি হাসপাতালগুলির নরকতূল্য পরিষেবা ও শিশুর স্বাস্থ্যের উপযোগী পরিকাঠামোর অভাব।

কিন্তু নতুন সরকারের তরফেও স্বাস্থ্য সচিব, স্বাস্থ্য অধিকর্তা থেকে শুরু করে বিভিন্ন হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ এবং সুপারদের সমস্বরে উক্তি যে, "এই হারে মৃত্যু স্বাভাবিক," "কোথাও কোনো গাফিলতি ছিল না", "সম্পূর্ণভাবে সংবাদ মাধ্যমের উচ্চগ্রাম প্রচার", "বিরোধী পক্ষের চক্রান্ত"— এসব অতীব নিন্দনীয়। বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গড়া তদন্ত কমিটি চিকিৎসায় গাফিলতির জন্য মৃত শিশুদের অভিভাবকদের নানা অভিযোগ সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে হাসপাতালগুলিকে 'ক্লিন চিট' দিলেন। তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো তদন্তের আগেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিজেরাই নিজেদের সম্পূর্ণভাবে নির্দোষ ও গাফিলতিশূন্য বলে শংসাপত্র দাখিল করলেন। এই ধরনের সরকারি মনোভাব ভয়ানক ক্ষতিকর, এর তীব্র বিরোধিতা করা উচিত।

'পুরুলিয়া মডেল' অনুসরণ করে ৪০টি বিশেষ শিশু চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপনের বা বিসিরায় শিশু হাসপাতালে শিশুদের আইসিইউ দ্রুত চালু করা, চিত্তরঞ্জন শিশু হাসপাতালে এসএনসিইউ চালু করার কর্মসূচি প্রশংসনীয়। সঠিক পদক্ষেপ প্রতিটি জেলা হাসপাতালে শিশু ব্লক তৈরি করার সিদ্ধান্ত। কিন্তু কেবল তৃতীয় স্তরের (Tertiary care) চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতি করে শিশুমৃত্যু ঠেকানো যাবে না। মা ও শিশুর সামগ্রিক পুষ্টি, ১০০ শতাংশ গর্ভকালীন পরিষেবা, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে পুষ্টি সংক্রান্ত পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলি (Nutritional Rehabilitation Centre) ভালোভাবে চালু করা, স্বাস্থ্যকর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরামর্শদান, নিরাপদ পানীয় দল ও নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন— এসব ছাড়া সরকারি হাসপাতালে শিশুমৃত্যু কমানো সম্ভব নয়। সেসব বিষয়ে আশাকরি রাজ্য সরকার অচিরেই ঘোষণা করবেন। বুঝবেন যে, দামি দামি যন্ত্রপাতি আর ঝাঁ চকচকে শিশুবিভাগ মূল সমস্যা সমাধানের ছোট্ট একটি অংশ মাত্র। গোড়া কেটে আগায় জল দিলে গাছ যেমন বাঁচে না, শিশুদের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যা তেমনি এনআইসিইউ তৈরি করে বা টাস্ক ফোর্স গঠন করে আদৌ মিটবে না।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পি-পি-পি

সবশেষে আসবো জেলা হাসপাতালগুলিতে কর্পোরেট স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের প্রশ্নে। যার পোষাকি নাম পি-পি-পি এবং যার বিষময় ফলাফল ঢাকুরিয়ার 'আমরি' হাসপাতালের ক্ষেত্রে জনগণ প্রত্যক্ষ করেছেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য বহু রাজ্যে এবং অন্য দেশেও বারবার প্রমাণিত হয়েছে যে, বিশ্বব্যাঙ্ক নির্দেশিত সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার এই ধরনের বেসরকারিকরণ জনস্বার্থের পরিপন্থী ও গরীব মানুষের পক্ষে দারুণ ক্ষতিকারক। 'সকলের জন্য স্বাস্থ্য' এবং সরকারি বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ একসাথে চলার আশা করা সোনার পাথরবাটিতে করে কাঁঠালের আমসত্ত্ব খাবার মতোই অসম্ভব। এ বিষয়ে 'অনীক'-এর নভেম্বর ২০১১ সংখ্যায় বর্তমান প্রবন্ধকারেরই একটি প্রবন্ধ রয়েছে— আগ্রহী পাঠকরা পড়ে দেখতে পারেন। এমনকি যোজনা কমিশনের গড়া উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটি ভারতবর্ষে সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার (Universal Health Care)-এর লক্ষে যে রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করেছেন, তাতেও সরকারি পরিষেবার বেসরকারি-করণ নিয়ন্ত্রণ, বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীদের উপর নজরদারি এবং মুনাফাভিত্তিক (for profit) স্বাস্থ্য ব্যবসায়ী সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে না যাওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। অন্যান্য কাজে যেসব পি-পি-পি কার্যক্রম চলছে তা মূলত সরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (Not for profit বা NGO), সামাজিক নানা সংস্থা (Community Based Organisations) ও পঞ্চায়েতিরাজ সংস্থাগুলির (Panchayati Raj Institutions) সাথে, আরএনটেগোর গ্রুপ বা অন্য কোনো বাণিজ্যিক সংস্থার সাথে নয় (ব্যতিক্রম একমাত্র কর্নাটক ও কিছুটা গুজরাট)। অথচ ডিসেম্বর ২০১১ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওয়েবসাইটে 'মেডিক্যাল সার্ভিস কর্পোরেশনের' প্রস্তাবে বলা হয়েছে—

(ক) সরকার ত্রিশ বছরের জন্য (অথবা যতদিন না বিনিয়োগ উঠে আসছে) জমি/বাড়ি লিজ দেবেন;

(খ) ঐসব বেসরকারি হাসপাতালে রোগি (Client বা খরিদ্দার) সুনিশ্চিত করবেন;

(গ) যাতে বেসরকারি হাসপাতালকে জেলায় জেলায় প্রতিযোগিতায় পড়তে না হয়, সেজন্য প্রয়োজনে সরকারি পরিষেবা বন্ধ করে দেবেন।

[Concept Paper cum Suggestion Solicitation Paper for Health Care Infra-structure build up in Publice Private Partnership (PPP) Model]

নতুন সরকারের এই পি-পি-পি মডেল বামফ্রন্ট আমলে অনুসৃত জনবিরোধী মডেলেরই সম্পূর্ণ প্রতিরূপ। বিশেষ করে জেলা সদর হাসপাতালগুলিতে লাভজনক তৃতীয় স্তরের পরিষেবায় (টার্সিয়ারি কেয়ার, যেমন নিউরোসার্জারি, কার্ডিওথোরাসিক সার্জারি প্রভৃতি) স্বাস্থ্যব্যবসায়ীদের ডেকে আনা, কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে পরিকাঠামো গড়ে দেওয়া, তাদের খরিদ্দার (!) সুনিশ্চিত করা এবং তারা যাতে প্রতিযোগিতার মুখে না পড়ে সেজন্য এমনকি সরকারি চিকিৎসা বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি এককথায় সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

বাঘা যতীন হাসপাতালের বেসরকারিকরণ পূর্বতন সরকার চূড়ান্ত করে গেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে তা স্থগিত হয়েছে। ঢাকুরিয়ার 'আমরি'তে চূড়ান্ত দুর্নীতি ও বেনিয়মের ফলে নিহত ৯৩ জন মানুষের 'আমরি'র ডিরেক্টারদের গ্রেপ্তার করে সরকার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছেন। কর্পোরেট স্বাস্থ্যব্যবসায়ী ও বণিকসভার হুমকির কাছে মুখ্যমন্ত্রী মাথা নোয়ান নি। সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্রের সম্পাদকের তদ্বিরও ব্যর্থ হয়েছে বলে খবরে প্রকাশ। এইসব পদক্ষেপকে মানুষ বিপুলভাবে সমর্থন করেছেন।

কিন্তু যৌথ উদ্যোগের নামে সরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিভিন্ন জেলায় কর্পোরেট হাসপাতালগুলির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা পুরনো জমানার কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। আমাদের মতো 'ঘরপোড়া গরু'-রা সিঁদুরে মেঘ দেখে আতঙ্কিত।

শতবর্ষে দেবব্রত বিশ্বাস— স্মরণে, বরণে

প্রিয়দর্শী চক্রবর্তী

১৯৭৪-এর ১৪ই এপ্রিল *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় 'কার গান? কার সুর' শীর্ষক একটি প্রতিবেদনে 'স-ক-ঘ' (অর্থাৎ সন্তোষ কুমার ঘোষ) প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের গানের ওপর 'স্টীম-রোলার' চালানোর মারাত্মক অভিযোগ আনলেন। এই প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়ায় দেবব্রতর অনুরাগী মহলে তীব্র আলোড়ন তৈরি হলো। প্রতিবাদে আছড়ে পড়লো চিঠিপত্রের ঢেউ। এই ঘটনার ঠিক এগারো মাসের মাথায় (২৫শে মার্চ, ১৯৭৫) *যুগান্তর* পত্রিকায় 'বিশ্বভারতীর খামখেয়ালিপনা' শীর্ষক স্টাফ রিপোর্টারের প্রতিবেদনে বিশ্বভারতী কর্তৃক দেবব্রত বিশ্বাসের কণ্ঠরোধের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানানো হয়। প্রতিক্রিয়ায় আবার আছড়ে পড়লো চিঠিপত্রের ঢেউ। ধিক্কার উঠল কণ্ঠরোধের এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে। একজন কণ্ঠশিল্পীকে কেন্দ্র করে বাদানুবাদের এই তীব্র আলোড়ন বাঙালির সংস্কৃতিচর্চার ইতিহাসেও কিছুটা অভূতপূর্বই ছিলো, যে প্রতিক্রিয়ার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ছিলো না, ছিলো অগণিত গুণগ্রাহী ভক্তকুলের আন্তরিকতা। যাই হোক, বিতর্কটিকে আর বাড়তে না দিয়ে দেবব্রত নিজেই একটি আত্মজীবনী লিখতে উদ্যোগী হলেন। নাম দিলেন 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত'। বইটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৯৭৮-এ। বইয়ের মুখবন্ধে দেবব্রত লিখেছেন— "...আমার মনে আছে আমি জন্মেছিলাম 'ম্লেচ্ছ' হয়ে— শেষজীবনে রবীন্দ্রসঙ্গীত জগতে হয়ে গেলাম 'হরিজন'...। এখন এই কেন 'ম্লেচ্ছ' এবং কেনই বা 'হরিজন'-এ স্থিত হওয়া— এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে দেবব্রত ওরফে জর্জ বিশ্বাসের বেড়ে ওঠার ইতিহাসের দিকেই আমাদের একটু চোখ ফেরানো প্রয়োজন, বিশেষত গত ২২শে আগস্ট, ২০১১-তে জন্মশতবর্ষ অতিক্রম করে যাওয়া এই শিল্পীকে নতুনভাবে ফিরে দেখতে এর চেয়ে ভালো উপলক্ষ আর হতেই পারে না।

পূর্ববাংলার কিশোরগঞ্জে ১৯১১-র ২২শে আগস্ট দেবেন্দ্রকিশোর ও অবলা বিশ্বাসের একমাত্র পুত্র দেবব্রতর জন্ম। নিজের পরিবারের সঙ্গে ব্রাহ্মদের যোগাযোগ সম্পর্কে দেবব্রত নিজেই জানাচ্ছেন— "ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যোগ— আমার ঠাকুর্দা ব্রাহ্ম ছিলেন, সুতরাং বংশপরম্পরায় আমি ব্রাহ্ম। তবে ব্রহ্মা-ট্রহ্মার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই...।" তবে ব্রাহ্ম পরিবারের সদস্য হিসাবে শৈশবেই তীব্র সামাজিক প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়েছিলেন। বহু হিন্দু বাড়ির উঠোন থেকে বারান্দায় ওঠা বা খেলার মাঠে স্বতস্ফূর্ত যোগদানের অধিকারে যে তিনি বা তাঁর ভগ্নীরা বঞ্চিত ছিলেন তা তাঁর আত্মজীবনীতে স্পষ্ট। অন্যদিকে গোঁড়া ব্রাহ্ম পরিবারে সকাল-বিকেল উপাসনার বাধ্যতা বা বাবার কড়া অনুশাসন দেবব্রতকে আরও বেপরোয়া করে তুলেছিল। ইংরেজভক্ত বাবাকে লুকিয়ে 'ইংরেজ বিতাড়ন'-এর আগ্রহে গোপনে যোগ দিতেন কংগ্রেসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। গাইতেন মুকুন্দদাসের গান। গান শেখার প্রথম তালিম প্রসঙ্গে দেবব্রতর মন্তব্য— "মাঝি-মাল্লাদের গান, মুসলমান রাখাল ছেলেদের গান, ভিখারীদের গানগুলি আমাদের কানে ও গলায় উঠে যেত। তাছাড়া আমাদের মা তো সংসারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে সব সময়েই গুন্‌গুন্‌ করে গাইতেন। বাড়িতে একটি ছোট হারমোনিয়াম ছিলো, সেটা বাজিয়ে রোজ সন্ধ্যায় মা ব্রহ্মসংগীত গাইতেন। শুনতে শুনতে গানগুলি আমার এবং বোনেদের গলায় উঠে যেত..."। 'কলের গানের যন্ত্রে' শোনা কে. মল্লিক, বেদনা দাসী, আঙ্গুরবালা বা ইন্দুবালাদের মতো তখনকার প্রথিতযশা শিল্পীদের আধুনিক গানও সমানতালেই শিখে নিতেন পাশাপাশি।

১৯২৭-এ কিশোরগঞ্জ হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে ভর্তি হন ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে। সে-সময় সরস্বতী পুজোর ওপর বিধিনিষেধকে কেন্দ্র করে কলকাতায় হিন্দু ছাত্ররা দলবদ্ধভাবে সিটি কলেজ চত্বর ত্যাগ করলে ব্রাহ্ম পরিবারগুলির কাছে তাদের সন্তানদের ঐ কলেজে ভর্তি করার আবেদন জানানো হয়। আবেদনে সাড়া দিয়ে ১৯২৮-এ দেবেন্দ্রকিশোর দেবব্রতকে কলকাতায় সিটি কলেজেই পাঠিয়ে দেন। শিকড়-ছিন্ন কিশোরের নতুনতর জগত— শহর কলকাতার রাস্তা-ঘাট-গলি-মাঠ-ময়দান— এ সব কিছুই নিয়ে এক পৃথক মুক্ত আবহাওয়ায় তাঁর জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হল। জন্মের সময় একজন ইউরোপীয় নার্স একটি নাম দিয়েছিলেন, যে নামের ব্যবহার ছিল না কিশোরগঞ্জে। কলকাতায় নিজেকে পরিচিত করালেন সেই অপ্রচলিত 'জর্জ' নামে। ২১১ কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ'-এ একটু-আধটু যাতায়াতও শুরু করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সমাজের গানের দলে নিজের জায়গাও করে নিয়েছিলেন। কিন্তু কখনই ওই পরিপাটি পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারেন নি স্বভাব-বাউন্ডুলে দেবব্রত। ১৯২৮-এ ব্রাহ্ম সমাজের শতবার্ষিকী উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথকে চাক্ষুষ দেখার মধ্যে দিয়ে যুবক দেবব্রতর আজন্মলালিত আকাঙক্ষা বাস্তব রূপ পেল। প্রথমবার শান্তিনিকেতন আসেন ১৯৩১-এর পৌষ উৎসবে। প্রথা ভেঙে সঙ্গীতভবনের তৎকালীন অধ্যক্ষ হেমেন্দ্রনাথ রায়ের উপস্থিতিতেই ১৯৩৩-এর বর্ষামঙ্গলের সময় এক ঘরোয়া আসরে গেয়েছিলেন হিমাংশু দত্ত আর শচীন দেব বর্মনের গান। ক্রমশ শান্তিনিকেতনে যাতায়াত বাড়লেও

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মুখোমুখী সাক্ষাতের কোন ইচ্ছা বা চেষ্টা তাঁর ছিল কিনা, এ-বিষয়ে কোন উল্লেখ তাঁর আত্মজীবনীতে অন্তত নেই। আইএ পাশ করে বিদ্যাসাগর কলেজে বিএ পড়তে গিয়ে তিনজন বিখ্যাত সুরশিল্পীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা বাড়ে — শৈলেন দত্তগুপ্ত, হিমাংশু দত্ত ও ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। মার্কাস স্কোয়ারের মেসে তাঁর ঘরে দেবব্রত সঙ্গী পেলেন সন্তোষ সেনগুপ্তকে। সঙ্গীতের এক বৃহত্তর জগত এভাবেই ক্রমশ তাঁর সামনে উন্মোচিত হতে লাগলো।

এরই ফাঁকে ১৯৩৩-এ অর্থনীতিতে এমএ পাশ করে পরের বছর হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে পঞ্চাশ টাকা বেতনে চাকুরিতে ঢুকে পড়লেন। এখানে সহকর্মী হিসাবে তিনি পেলেন চিন্মোহন সেহানবীশকে, যাঁর মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে দেবব্রতর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ তৈরি হলো। তাঁর নিজের ভাষায়—''১৯৩৮ সন থেকে আমার মনটি বেশ বাঁয়ে হেলে চলতে শুরু করল...''। ক্রমশ গানের সূত্র ধরে দেবব্রত ৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রিটের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেলেন। ১৯৩৯-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ', 'ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিটিউট' ইত্যাদি কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক শাখা-সংগঠনগুলির ক্রিয়াকলাপের মাত্রা তীব্র আকার নেয়। গণনাট্য আন্দোলনের এই দলগুলির সঙ্গে দেবব্রত ওরফে জর্জ অনেক স্বচ্ছন্দে বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে গেয়ে বেড়াতে লাগলেন বিনয় রায়ের 'সপ্তকোটি জনরঙ্গভূমি' বা সলিল চৌধুরীর 'আমার প্রতিবাদের ভাষা'। ১৯৪৩-এর সেই কুখ্যাত মন্বন্তরের দিনে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র লিখলেন এই মনুষ্য-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের ওপর বেশ কয়েকটি গান আর যৌথভাবে দেবব্রতর সঙ্গে বসে গানগুলিতে সুর সংযোজনও করা হলো। বিখ্যাত এই 'নবজীবনের গান' তাঁরা পরিবেশন করতে শুরু করলেন পথেঘাটে দল বেঁধে। শ্রদ্ধেয় খালেদ চৌধুরীর স্মৃতিচারণায় জানা যাচ্ছে যে, এই সময় 'নিউ থিয়েটার্স'-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রে জর্জ পঙ্কজকুমার মল্লিকের কাছে একটি হিন্দি গান শিখেছিলেন— 'করবটে বদলতা হুয়া জমানা, একদিন আনেওয়ালা হ্যায়'। হিন্দি ভাষাভাষী অঞ্চলে আইপিটিএ-র বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেবব্রতর গলায় এই গান শ্রোতাদের হৃদয়ে ঢেউ তুলতো। সঙ্গী পেয়েছিলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস, হারীন চট্টোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য বা শম্ভু মিত্রর মত মানুষদের। তবে ব্যক্তিত্বের অমোঘ দিকটিকে এখানে এড়াতে পারলেন না। গণচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশে আমুল পরিবর্তন আনার স্বপ্নে বিভোর দেবব্রত যখন বুঝলেন, রাজনৈতিক মিছিল-সভাসমিতির গান মানেই গণসংগীত— প্রচলিত এই ধারণার বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি জেদ ধরলেন বামপন্থী মানুষদের সমাগমে রবীন্দ্রনাথের গান গাইবেন। ১৯৪২-এ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সভাঘরে রবীন্দ্রনাথের গান দৃপ্ত ভঙ্গিমায় গেয়ে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে ভাষা সুর ও বলিষ্ঠ উপস্থাপনার গুণে রবীন্দ্রনাথের গানও হয়ে উঠতে পারে প্রতিবাদের হাতিয়ার। 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত'-এ দেবব্রত লিখছেন যে, শ্রীহট্ট থেকে আসা একটি নতুন ছেলে, নাম হেমাঙ্গ বিশ্বাস, অনুষ্ঠানের শেষে এসে স্বীকার করেছিলেন— ''জর্জদা রবীন্দ্রসংগীত যেভাবে আপনি গাইলেন সেইভাবে যে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া যায় তা আগে ভাবতেও পারিনি''। সমাজের সর্বস্তরে, তা সে ব্রহ্ম-উপাসনার সভাগৃহই হোক বা গণআন্দোলনের মঞ্চ, রবীন্দ্রনাথের গানের সর্বজনীন আবেদনকে শ্রোতার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষমতা বলিষ্ঠ কণ্ঠের অধিকারী জর্জের সহজাতই ছিল।

প্রায় গোটা চারের দশক জুড়েই গণনাট্যের নিয়মিত কর্মী ছিলেন দেবব্রত। কখনও স্নেহাংশু আচার্যের ডাকে কমিউনিস্ট পার্টির জন্য অর্থ সংগ্রহে ছুটেছেন উত্তরবঙ্গে অনুষ্ঠান করতে (১৯৪৬), আবার বামপন্থী মহিলা সমিতির উদ্যোগে শ্রীরঙ্গমে (বিশ্বরূপা থিয়েটার হল) অভিনীত 'রক্তকরবী'-তে তৃপ্তি মিত্র, শম্ভু মিত্র, কালী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজল রায়চৌধুরীর সঙ্গে দাপিয়ে অভিনয় করছেন বিশু পাগলের ভূমিকায় (১৯৪৭)। গণনাট্যের দলের সঙ্গে ঘুরেও বেড়িয়েছেন প্রায় গোটা ভারতবর্ষ। রাজনৈতিক মঞ্চে গেয়ে গেছেন একের পর এক রবীন্দ্রনাথের গান। এ-প্রসঙ্গে গণনাট্যের সদস্যা সীমা দাসের স্মৃতিচারণায় একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৪৯-এর কোনো এক সময়ে কলকাতার বালিগঞ্জে গণনাট্য সংঘের শো-এর শুরুতে কিছু কমিউনিস্ট বিরোধী মানুষের হুঙ্কার আর প্রবল ইট বর্ষণে অনুষ্ঠান প্রায় ভন্ডুল হবার মুখে ঐ প্রবল বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনতে সাহসী জর্জ মঞ্চে উঠে দৃপ্ত উদাত্ত ভঙ্গিমায় গেয়ে উঠলেন—'ঐ মহামানব আসে'। কোলাহলমুখর জনতা নিমেষে চুপ। এর পর গেয়ে চললেন একের পর এক রবীন্দ্রনাথের গান— 'ঐ ঝঞ্চার ঝংকারে', 'বাঁধ ভেঙে দাও' ইত্যাদি। সমবেত শ্রোতাদের করতালি আর উচ্ছাসে পরিবেশ একেবারে আয়ত্তের মধ্যে চলে এলো। ব্যতিক্রমী শিল্পীর প্রতিবাদের ভাষাও ছিল এভাবেই ব্যতিক্রমী। ঐ একই বছরে এক গোপন চিঠির মাধ্যমে দেবব্রত নির্দেশ পান যে, আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টির জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে। সেই উদ্দেশে তাঁর নিজের বাড়িতেই মহড়া চললো রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'-র। অর্জুনের গানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও চিত্রাঙ্গদার গানে সুচিত্রা মিত্রের সঙ্গে গণনাট্যের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে নৃত্যনাট্যটি মঞ্চস্থ হয়েছিলো চৌরঙ্গি রোডে ওয়াইএমসিএ-র হলঘরে।

যাইহোক, দেশ ভাগাভাগির প্রশ্নে অবশ্য কমিউনিস্টরা নেহরু-সরকারকে সমর্থন জানালে দেবব্রত তা মেনে নিতে পারেন নি। পার্টির এই নীতিকে যে তিনি অযৌক্তিক মনে করেন তা তিনি নিরঞ্জন সেন বা বিনয় রায়দের মতো গণনাট্যের

বন্ধুদের জানিয়েও দিয়েছিলেন। তাছাড়া ১৯৪৮ থেকে পুনরায় পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ায় এবং অনেক নেতা আত্মগোপন করায় গণনাট্যের কাজও স্তিমিত হয়ে আসে। তবে সংস্কৃতি চর্চায় ভাঁটা পড়েনি। ১৭৪ই রাসবিহারী এ্যাভিনিউতে ১৯৫১ নাগাদ দেবব্রতর ঘরে বসে তাঁর হারমোনিয়ামেই সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'অবাক পৃথিবী' কবিতায় সুর দিলেন সলিল চৌধুরী। আসতেন ঋত্বিক ঘটক, শম্ভু মিত্র, কলিম শরাফি ও অন্যান্য আরো অনেকে। ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত 'মেঘে ঢাকা তারা' (১৯৬০) ছবিটিতে 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি' বা 'কোমলগান্ধার' (১৯৬১)-এ 'আকাশ ভরা সূর্য তারা' আজও শ্রোতাদের আবেগে ঢেউ তোলে। অনেক বছর পরে ঋত্বিকের শেষ ছবি 'যুক্তি তর্ক আর গপ্পো' (১৯৭৭)-তে সুশীল মল্লিকের সঙ্গে যৌথভাবে গাওয়া দেবব্রতর গান 'কেন চেয়ে আছ গো মা' শুনলে শিল্পমুগ্ধ রাজনীতিসচেতন মানুষের গায়ে আজও কাঁটা দিয়ে ওঠে। আসলে এ-সব সৃষ্টিরই সৃজনের প্রাথমিক বীজ ঐ গণনাট্যের দামাল দিনেই উপ্ত হয়েছিলো ।

হিন্দুস্তান ইনসিওরেন্স কোম্পানির চাকরিজীবনে শেষদিন পর্যন্ত সহকর্মী থাকা চন্দ্রশেখর বসুর স্মৃতিচারণায় কর্মজীবনেও দেবব্রতর প্রতিবাদী ও বলিষ্ঠ চরিত্র একই মাত্রায় উজ্জ্বল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে শ্রেণীসংগ্রামের আদর্শ বা কর্মীদের অধিকার আদায় করে নেওয়ার আন্দোলন সংক্রান্ত ধারণায় বদল আসে। কর্মচারীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার বা ছাঁটাই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন হয়ে ওঠে নিত্যদিনের হাতিয়ার। এক্ষেত্রেও জর্জ সবার আগেই এগিয়ে ছিলেন। ১৯৫২ নাগাদ চন্দ্রশেখরবাবু ও আরও কয়েকজনের ওপর অন্যায়ভাবে নেমে আসা ছাঁটাই-এর কুঠারের বিরুদ্ধে কর্মবিরতি, সভা-সমাবেশ-বিক্ষোভে নেতৃত্বে থাকলেন সেই জর্জ। আন্দোলনের চাপে কর্তৃপক্ষ শেষপর্যন্ত কর্মীদের ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হন। মজার ব্যাপার, চন্দ্রশেখরবাবু জানাচ্ছেন, ইউনিয়নের মঞ্চেও সংগ্রামী কর্মীদের উদ্দীপ্ত করতে দেবব্রত গেয়ে যেতেন একের পর এক রবীন্দ্রনাথের 'প্রতিবাদের গান বিদ্রোহের গান'।

১৯৪৪-এ দেবব্রতর রেকর্ডের জগতে প্রবেশ। প্রথম রেকর্ড কনক দাসের (বিশ্বাস) সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে 'সংকোচের বিহ্বলতা' এবং 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' (এইচএমভি)। একক কণ্ঠে প্রথম রেকর্ড অনাদি দস্তিদারের পরিচালনায় ১৯৪৬-এ কলম্বিয়া কোম্পানি থেকে 'আছ আকাশপানে তুলে মাথা' এবং 'এ শুধু অলস মায়া'। সেই শুরু। এসময় থেকেই পর পর বেরোতে থাকে একের পর এক রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড। গায়ক দেবব্রতর জীবনে প্রথম বিতর্ক 'তুমি রবে নীরবে' গানটিকে কেন্দ্র করে, যেখানে সঞ্চারী অংশে দেবব্রত 'সফল স্বপন'-র জায়গায় গাইলেন 'সকল স্বপন', যা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনেই মুদ্রিত হয়েছিলো। দেবব্রতর বক্তব্য ছিল, 'বীণাবাদিনী' পত্রিকায় এ-গানের স্বরলিপি অংশে 'সকল' শব্দটিই মুদ্রিত। শেষ পর্যন্ত ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী দেবব্রতর সমর্থনে রায় দেওয়ায় গানটির রেকর্ড দিনের আলো দেখতে পায়।

এরই মধ্যে ১৯৫৩-র জুলাই মাসে ভারতীয় শান্তি কমিটির উদ্যোগে উনত্রিশ জনের একটি প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে দেবব্রত চীন সফরে যান। বলিষ্ঠ কণ্ঠে তাঁর বিপ্লবী গান চৌ এন লাই-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পায়। ফিরে এসে চীন সফরের চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করলেন 'স্বাধীনতা' পত্রিকায়, যা পরে বই আকারে বেরোয়, নাম 'অন্তরঙ্গ চীন' (প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ১৯৬৮)। অবশ্য চীন সম্পর্কে তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা কখনই গোঁড়াপন্থী হয়ে পড়েনি। ১৯৬২-পরবর্তী চীনবিরোধী উগ্র জাতীয়তাবাদী আবেগে তিনি যেমন কোনোদিনই গা ভাসিয়ে দেন নি, তেমনি পরে আবার বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে চীনের ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি ছিলেন কঠোর সমালোচক।

ইতিমধ্যে দেবব্রত ক্রমশ রবীন্দ্রসংগীতকে তার ভাবগম্ভীর বৈঠকখানা থেকে বের করে পথে-বিপথে সকলের দরজায় পৌঁছে দিতে শুরু করলেন। অবশ্য ইতিমধ্যে এইচএমভি তাঁকে জনপ্রিয় আধুনিক গান রেকর্ডের প্রস্তাব দিলে দেবব্রত সবিনয়ে তা প্রত্যাখান করে ঐ কোম্পানির সঙ্গে সব সম্পর্কই ছিন্ন করেন। দীর্ঘ প্রায় এক দশক অপেক্ষার পর ১৯৬০ নাগাদ হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানির আহ্বানে নতুন করে দেবব্রতর রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড প্রকাশ শুরু হয়। ১৯৬১-তে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে এই কোম্পানির তরফে প্রকাশিত হল দেবব্রত বিশ্বাসের দুটি গান— 'আকাশভরা সূর্যতারা' এবং 'যেতে যেতে একলা পথে'। জর্জ বিশ্বাসের অসাধারণ গায়নভঙ্গী, শব্দ উচ্চারণ ও প্রয়োগরীতি রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে সাধারণ শ্রোতাদের ধারণাটাই পাল্টে দিলো। গানের বাণীর নাটকীয়তাকে উপস্থাপিত করতে রবীন্দ্রসংগীতে চিরকালীন ব্যবহৃত এস্রাজ, পাখোয়াজ, খোল বা তানপুরার পরিবর্তে অর্কেস্ট্রেশনের প্রয়োগ, প্রিল্যুডের ক্ষেত্রে প্রথা ভাঙা বা ইন্টারল্যুডে বৈচিত্র্যে এনে তার সাহায্যে অন্তরা বা সঞ্চারীর প্রবেশপথকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার মধ্য দিয়ে জর্জ প্রথাগত রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনে এক বিপ্লবই আনলেন বলা যায়। রেকর্ডটির অসামান্য সাফল্যের পর জর্জের দরাজ কণ্ঠে একের পর এক রেকর্ডের গান রবীন্দ্রসংগীতকে বৃহত্তর শ্রোতা বা আমজনতার দরবারে তুলে নিয়ে গেল।

থমকে যেতে হলো ১৯৪৬-তে। বিশ্বভারতী সংগীত সমিতির তরফে দেবব্রতর গাওয়া 'এসেছিলে তবু আস নাই' এবং 'মেঘ বলেছে যাব যাব' গান দুটি স্বরলিপি বহির্ভূত সুরে গাওয়া হয়েছে— এই অভিযোগে অননুমোদিত বলে জানানো হয়। সন্তোষজনক সদুত্তর না পেয়ে দেবব্রতও নিজের অবস্থানে অবিচল থাকেন। শেষে ১৯৬৫ নাগাদ শান্তিদেব ঘোষের হস্তক্ষেপে সমস্যার আংশিক সমাধান হয় ও গানদুটি প্রকাশিতও হয়। এভাবেই জটিল এক বিতর্কের সূত্রপাত ঘটল। ১৯৬৯-এ

আবার দুটি গান বিশ্বভারতী সংগীত সমিতির অনুমোদন পেল না— 'পুষ্প দিয়ে মারো যারে' এবং 'তোমার শেষের গানের'। এবার অভিযোগ মাত্রাতিরিক্ত যন্ত্রানুষঙ্গ ব্যবহারের যা নাকি একেবারেই রাবীন্দ্রিক ঘরানার অনুসারী নয়। এমনকি জর্জ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতারও অভিযোগ আনা হল। কিন্তু দেবব্রতর তরফে যুক্তি ছিল এই যে, শিল্পী যদি সচেতন চিন্তায়, দক্ষতায় যন্ত্র ব্যবহারে উদ্যোগী হন, তবে গানের নিজস্ব আবেদন বিঘ্নিত হওয়ার কোন কারণ থাকা উচিত নয়। এ ব্যাপারে চিঠিপত্র চালাচালি করেও যখন কোনও লাভ হল না, তখন খানিকটা হতোদ্যম হয়েই দেবব্রত সাময়িকভাবে রবীন্দ্রনাথের গান রেকর্ড করা বন্ধ করে দেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই সংঘাত তাঁর জনপ্রিয়তায় কোন ভাটা টানতে পারে নি, বরং অসংখ্য গানের অনুষ্ঠান ও প্রকাশিত রেকর্ডগুলির বিক্রির পরিসংখ্যান তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির পরিচায়ক। ১৯৭০-এ হিন্দুস্থান রেকর্ডস-এর কর্ণধার চন্ডীচরণ সাহার অনুরোধে আবার কিছু নতুন রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করলেও তার মধ্যে কয়েকটি গান সংগীত সমিতির অনুমোদন পায়নি। তিক্ত হতাশ দেবব্রত এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র প্রশ্ন না তুলে চিরদিনের মতোই রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড না করার সংকল্প নিয়ে নেন। আজীবন প্রতিবাদী দেবব্রতর প্রাতিষ্ঠানিক আনুগত্যের কাছে মাথা না নোয়ানোর এ এক নীরব প্রতিবাদ। অথচ আনুমানিক একই সময়ে বহুল প্রচারিত একটি বাংলা সংবাদপত্রে রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের প্রাপ্ত রয়্যালটির একটি হিসেব প্রকাশিত হয়েছিলো, যেখানে বার্ষিক আটত্রিশ হাজার টাকা রয়্যালটি বাবদ প্রাপ্তির মাধ্যমে দেবব্রত ছিলেন তালিকার শীর্ষে। দ্বিতীয় স্থানে এক জনপ্রিয় বিশেষজ্ঞ শিল্পীর অর্থের পরিমাণ ছিল ষোলো হাজার টাকা এবং তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানের অঙ্ক ছিল যথাক্রমে চোদ্দ হাজার এবং আট হাজার টাকা। রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে রেকর্ড বিক্রির নিরিখে তাঁর সমকালে সবার মধ্যে এগিয়ে থাকা দেবব্রতর পক্ষেই বোধহয় এ-ধরনের অনমনীয় নিজের বিশ্বাসে ঋজু থাকার স্পর্ধা দেখানো সম্ভব ছিল।

অথচ পেশাগত জীবনে চরম বিতর্কের মধ্যেও কিন্তু দেবব্রত তাঁর রাজনৈতিক সত্তাকে কখনই বিসর্জন দেননি। ১৯৭১-এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর আত্মিক সমর্থন ছিলো। এপার বাংলার মানুষকে ওপার বাংলার এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল করার উদ্দেশে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় ও সুরে রেকর্ড করেছিলেন দুটি গান— 'ওই তারা চলে দলে দলে মুক্তি পতাকাতলে' এবং 'শোনো বাংলার জনসমুদ্রে জোয়ারের হুঙ্কার'। পরে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে বাংলাদেশ সফরেও যান। অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিও তাঁকে পীড়িত করতো। ১৯৭৫-৭৭-এ সেই 'জরুরি অবস্থা'-কালীন পরিস্থিতিতে যখন শান্তিনিকেতনে সুচিত্রা মিত্র 'জয়যাত্রায় যাও গো' গানের বন্দনায় ইন্দিরা গান্ধীকে বন্দিত করতে ব্যস্ত বা কলকাতায় সঞ্জয় গান্ধীর আমন্ত্রণে উৎপল দত্ত, শোভা সেন এবং শম্ভু মিত্রর মতো ব্যক্তিত্ব রাজভবনে উপস্থিত, তখন কিন্তু এই মোসাহেবির ভিড়ে দেবব্রতর অনুপস্থিতি নিজের রাজনৈতিক শিকড়ের প্রতি তাঁর তীব্র আস্থাকেই দিনের আলোর মতো পরিষ্কার করে দেয়।

তবে এ-সবকিছুর মধ্যেই বিশ্বভারতীর সৌজন্যে রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে বিচ্ছেদ তাঁর মনকে ক্রমাগত অস্থির করে তুলেছিল। এ সময় রবীন্দ্রসংগীতে ব্যবহৃত উপযোগী যন্ত্রের তালিকা সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের তৎকালীন সম্পাদক নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের সঙ্গে তাঁর বেশ কিছু বিতর্কিত চিঠি আদান-প্রদানও হয়। এমনকি, এভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়া দেবব্রত রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে দুটি গানও লিখে ফেলেন— 'গুরুদেব, গুরুদেব, তোমায় গুরু বলে আমি জানি' এবং 'বিশ্ববীণার কলধ্বনি তোমার মনোবীণার তারে তারে'। গানদুটিতে তাঁর সারাজীবনের আত্মনিবেদন ও শৃঙ্খলার বেড়াজালে আবেগের প্রকাশভঙ্গিমা রুদ্ধ হওয়ার বেদনা আর্তি হিসাবেই ফুটে উঠেছে। 'ব্রাত্যের গুরুবন্দনা' শিরোনামে রেকর্ডটি অবশ্য দিনের আলো দেখে অনেক পরে, ১৯৭৯-তে।

অবশেষে সংবাদমাধ্যমেও এ-নিয়ে চরম বিতর্ক শুরু হলো, যা শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। একদিকে প্রাতিষ্ঠানিক চাপ এবং অন্যদিকে সাধারণ শ্রোতৃবৃন্দের আবেগ— এই দুয়ের মাঝে দেবব্রতর বক্তব্য— "একদল যারা নাকি রবীন্দ্রনাথের গানের সো কলড্ এক্সপোনেন্ট অ্যান্ড এক্সপার্ট— তারা আমার গতিটাকে উল্টো করার জন্য নানারকম কায়দা করল। আর একটা সাইড-এ বহু রবীন্দ্রসংগীত ভক্ত যারা, তারা আমার গতিটাকে খুব সোজা করে দিল"... (উৎপলেন্দু চক্রবর্তী পরিচালিত তথ্যচিত্র 'দেবব্রত বিশ্বাস'-এ গৃহীত শিল্পীর সাক্ষাৎকারের অংশ)। শিল্পী-জীবনের এই গভীরতর দ্বান্দ্বিক সংকটেও কোথায় যেন দেবব্রতর এই প্রকৃতই জনগণের শিল্পী হয়ে ওঠার সুদীর্ঘ পথ সংস্কৃতিচর্চার ইতিহাসেই এক চরম সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়—প্রতিষ্ঠানের আধিপত্য বনাম জনগণের ঝোঁক। মজার ব্যাপার, দেবব্রতর মৃত্যুর পরদিন (১৯শে আগস্ট, ১৯৮০) বিতর্কের সূত্রপাত ঘটানো ওই 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-তে সন্তোষকুমার নিজেই লিখছেন— "শেষবার বলি, 'তুমি রবে নীরবে' এই গীতিটি তাঁর মতো করে কেউ গায় নি। স্বরাট ভরাট গলায় গাওয়া ঐ গান পূর্ণিমারই নিশীথিনী। এখন থেকে বাজানো রেকর্ডে রুদ্ধ সংগীত মুক্ত ভাগীরথী হয়ে যাবে..."। এখানেই বোধহয় শেষপর্যন্ত জিতে যান 'ব্রাত্য' দেবব্রত, জিতে যায় তাঁর উদাত্ত কালজয়ী কণ্ঠে স্বরলিপি-শৃঙ্খলের বন্ধন পেরিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের চিরকালীন আবেদন।

এই তো কিছুদিন আগেও, অর্থাৎ একবিংশ শতাব্দীর প্রথম

এর পর ৩৮ পৃষ্ঠায়

শতবর্ষে স্মরণ

প্রসঙ্গ : সুধী প্রধান

দীপংকর চক্রবর্তী

এক

ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, বিগত শতকের ২০'র দশকে তার সূচনা হলেও জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলনের প্রকৃত স্ফুরণ ঘটেছিল '৩০ ও '৪০-এর দশকে— যদিও সেসময় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনুসৃত লাইনের ক্ষেত্রে চরম ক্ষতিকর সব বিচ্যুতির পরিচয় মিলেছিল (যেমন, ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার যৌথ দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে মৌলিক বিচ্যুতি, কিংবা ধর্মীয় 'জাতিসত্তা', 'পাকিস্তান' বা দেশবিভাগের প্রশ্নে বিচ্যুতি প্রভৃতি)। তবু আত্মোৎসর্গকারী কমিউনিস্ট কর্মী ও সমর্থকদের আন্তরিকতা ও সক্রিয়তার ফলে এক দশকের মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলন, ফ্যাসিবাদের বিপর্যয়, সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতির পটভূমিকায় সারা দেশের, বিশেষত বাংলা, আসাম, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে প্রগতি লেখক সংঘ, ইউথ কালচারাল ইনস্টিটিউট, সোভিয়েত সুহৃদ সংঘ, ফ্যসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ, এবং বিশেষত গণনাট্য সংঘ প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও মননের চর্চা, এমনকি শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক মানুষের মধ্যে বিরাট এক গণচেতনার বিস্ফোরণ সূচিত হয়েছিল, কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্নরাই এ সব ক্ষেত্রে সামনের সারিতে চলে এসেছিলেন। সবচেয়ে বড়ো কথা এই আন্দোলনের অভিঘাতে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটি নবজাগরণের প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই সামাজিক আলোড়নে যারা সবচেয়ে সক্রিয় ও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশেরই বয়স তখন ছিল তিরিশের আশেপাশে। ফলত সম্প্রতিকালে একের পর এক শুরু হয়েছে তাঁদের জন্মশতবর্ষের উদযাপন— দেবব্রত বিশ্বাস, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সুধী প্রধান প্রভৃতি। উল্লেখ্য যে, যাঁদের নাম বললাম তাঁদের সবাই-ই ছিলেন সঙ্গীত বা নাট্যশিল্পী। তবু তাঁদের মধ্যে একজনের নাম আলাদা করে বলা প্রয়োজন একারণেই যে, তাঁর প্রাথমিক পরিচিতি ছিল কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে সাংস্কৃতিক সংগঠক হিসেবে। তিনি সুধী প্রধান। অভিনেতা, লেখক, প্রাবন্ধিক, লোকশিল্প ও লোকসংস্কৃতির এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের অনলস গবেষক ও সংগঠক হিসেবে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা এক কথায় ছিল অবিস্মরণীয় ও অনন্য।

সেই যুগের বহু কমিউনিস্ট কর্মীর মতো রাজনীতির প্রাঙ্গণে সুধী প্রধানেরও যাত্রা শুরু হয়েছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তিনি অনুশীলন দলে সক্রিয় অংশ নিতে শুরু করেন এবং ক্রমে ক্রমে মার্কস্‌বাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। গণসংস্কৃতির প্রতি তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল প্রথম থেকেই। ১৯৩৬-এ প্রগতি লেখক সংঘের জন্মের মধ্যে দিয়ে যে রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার সূচনা হয়েছিল, তিনি তার সঙ্গেও প্রাথমিক অবস্থায় যুক্ত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, এরই ধারাবাহিকতায়, এবং বিভিন্ন রাজ্যে গণসংগ্রামে অঙ্গ হিসেবে গড়ে ওঠা গণসাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় হিসেবে ১৯৪৩ সালে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম প্রকাশ্য কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে একটি সমাজ-সচেতন সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে সে বছরই সর্বভারতীয় স্তরে গড়ে উঠেছিল ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। গণনাট্য সংঘ গড়ে উঠেছিল রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক একটি প্রক্রিয়ার পরিণতিতে, একটি সমাজ-সচেতন আন্দোলন হিসেবে।

এই সংগঠনের কার্যক্রমে নাটক একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। বাংলা নাটক সে-সময় মূলত পেশাদারি ও ব্যবসায়িক মঞ্চের গড্ডালিকা প্রবাহে নিমজ্জিত ছিল। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা, শিল্পকলা প্রভৃতি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতির মাধ্যমে যে শিল্পগুণ ও মর্যাদা অর্জন করেছিল, বাংলা রঙ্গমঞ্চে তার খুব সামান্যই প্রভাব পড়েছিল। জীবনবিমুখ, শিল্পগুণহীন নিম্নমানের নাটকই প্রধানত রঙ্গমঞ্চ দখল করেছিল। দর্শকদের মনোরঞ্জন করে টাকা কামানোটাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রথম যুগের দর্শক প্রধানত ছিলো জমিদার-মুৎসুদ্দি-মোসাহেব ও তল্পিবাহকের দল, সামন্ততান্ত্রিক অবক্ষয়ী সংস্কৃতির বাহক বাবুমশায়ের দল। 'কুলীনকুলসর্বস্ব', 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ', 'একেই কি বলে সভ্যতা?', 'নীলদর্পণ', 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী', 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' প্রভৃতি কুসংস্কার ও কুপ্রথা এবং সামাজিক অনাচারের বিরোধী বা স্বাদেশিকতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ নাটক ছিলো ব্যতিক্রম মাত্র। তবু তাতেই আশংকিত হয়ে ১৮৭২-এর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা কালাকানুন প্রণয়ন করে নাটকের কণ্ঠরোধ করার ব্যবস্থা করেছিল। এই পরিস্থিতিতে মঞ্চের ব্যবসায়ী মালিকেরা নিম্নমান ও নিম্নরুচির নাটকের যে শ্বাসরোধকারী পরিমণ্ডলের জন্ম দিয়েছিল, তার মধ্যেই গিরীশচন্দ্র, অর্ধেন্দু মস্তাফি, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতিদের নাটক করতে হয়েছে, তা থেকে বেরিয়ে আসার মতো সাহস বা এই পরিবেশ থেকে নাট্যজগৎকে মুক্ত করার মতো সামাজিক দূরদৃষ্টি তাঁদের ছিলো না। রবীন্দ্রনাথ তাই বাংলা রঙ্গমঞ্চের সেই বাস্তব অবস্থাটা সম্পর্কে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেছিলেন, সেখানে 'লক্ষ্মীর পেঁচা', 'সরস্বতীর পদ্ম'-কে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে স্বাদেশিকতার প্রভাবে কিছু নাটক মঞ্চস্থ হলেও, সেগুলির মধ্যে আধুনিক ও উন্নতমানের নাটক খুব

সামান্য ছিল। এই পটভূমিকার প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে শিশির ভাদুড়ীই প্রথম রুচি, শিল্পগুণ ও আধুনিকতার সমন্বয় ঘটিয়ে নতুন রীতির অভিনয়, নতুন আঙ্গিকের মঞ্চ-উপস্থাপনা ও শিল্পবোধসম্পন্ন পরিচালনার মাধ্যমে বাংলা নাট্যজগতে এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের বেড়াজাল ভেঙে ধনতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা ঘটালেও শিশির ভাদুড়ী সমাজ-চেতনার পরিচয় দিতে পারেন নি, সমাজের দ্বন্দ্ব সংঘাতকে উপলব্ধি করে সমাজ-প্রগতির লক্ষ্যে রঙ্গমঞ্চকে ব্যবহার করতে পারেন নি— প্রচলিত গতানুগতিক নাট্যধারাকে ঘষে মেজে সংস্কার করে আধুনিক শিক্ষিত দর্শকদের কাছে গ্রহণযোগ্য করার মধ্যেই তাঁর সাফল্য সীমাবদ্ধ ছিলো। বাংলা নাটককে একই সঙ্গে আধুনিক ও সমাজ-সচেতন ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার এই অসম্পূর্ণ দায়িত্বটিকেই পালন করেছিল গণনাট্য সংঘ।

দুই

'গণনাট্য' কথাটি নেওয়া হয়েছিল রমাঁ রঁল্যার 'পিপলস্ থিয়েটার' থেকে। পরিবর্তিত পটভূমিকায় ইউরোপের গতানুগতিক নাট্যধারার বাস্তববিমুখ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও মূলত প্রমোদমূলক চরিত্রের বিরোধিতা করে রঁল্যা ঘোষণা করলেন— নাটক মানুষের জীবন-সংগ্রামের পাশে দাঁড়াবে, তাদের ভাবনাচিন্তা, আশা-আকাঙক্ষা ও সংগ্রামকে রূপায়িত করবে— নাটক আর বিশুদ্ধ শিল্পের জন্য থাকবে না, তা হবে জনগণের জন্য। এই নাটকের মূল দর্শক, হবে ব্যাপক জনগণ— শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতি মানুষ। তাদের সামনে সহজবোধ্য ভঙ্গিতে ও ব্যয়বহুল মঞ্চের বদলে যেখানে যখন খুশি স্বল্প ব্যয়ে যাতে নাটক মঞ্চস্থ করা যায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই নাটক হবে উদ্দেশ্যমূলক। দর্শক ব্যাপক জনগণের রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে— বাস্তব জীবন সম্পর্কে, তাদের জীবনের সমস্যা সম্পর্কে এবং তা থেকে মুক্তির চিন্তা ও উপায় সম্পর্কে জনগণকে সচেতন ক'রে তোলার উদ্দেশ্যে গণনাট্য মঞ্চস্থ হবে। বস্তুত রঁল্যা নিজে মার্কসবাদী না হলেও গভীর প্রজ্ঞা ও সহানুভূতির সঙ্গে সোভিয়েত ও চীনের পিপলস্ থিয়েটারের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর এই বক্তব্য অনেকটাই মিলে যায় চীনের ইয়েনান আলোচনা সভায় শিল্প-সাহিত্য প্রসঙ্গে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে সারসংকলনমূলক মাওসেতুঙের বিখ্যাত ভাষণের সঙ্গে।

এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ তার প্রথম বুলেটিনেই (জুলাই, ১৯৪৩) ঘোষণা করেছিলো : "গণনাট্য মঞ্চায়িত করে জনগণকেই।" সেই বুলেটিনে দেশের তৎকালীন সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে নাটক যে সময়ের দাবি মেনে জনগণের স্বার্থে এগিয়ে আসতে পারে নি, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঘোষণা করা হয়েছিল : "স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির জন্য জনগণের সংগ্রামের প্রকৃত অভিব্যক্তি ও প্রেরণা হয়ে উঠেই কেবল শিল্পসাহিত্য ভবিষ্যতে এগিয়ে যেতে পারে"— এবং সেটা করার দায়িত্ব নিতে হবে গণনাট্য সংঘকে। আরও বলা হয়েছিল : "স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক ন্যায্যতা ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির জন্য আমাদের জনগণের সংগ্রামের অভিব্যক্তি ও অঙ্গ হয়ে ওঠাটাই আমাদের শিল্প-সাহিত্যের লক্ষ্য... জনগণ যে সমস্ত সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন, সেগুলির কারণ ও সমাধানের পথ সম্পর্কে তাদেরকে তা সচেতন করে তুলবে।" বলা হয়েছিল: "আমাদের শিল্প সৃষ্টি হবে সহজ ও সরাসরি",— সেজন্য লোকসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন, সমবেত সংগীত ও খোলা আকাশের নীচে নাটকের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

এই ছিল গণনাট্য সংঘের সাধারণভাবে সংস্কৃতি সম্পর্কে এবং বিশেষত নাটক সম্পর্কে ঘোষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, দৃষ্টিভঙ্গি। এর ভিত্তিতেই মাত্র দু'বছরের মধ্যে বাংলায় গণনাট্য সংঘের পতাকাতলে মঞ্চস্থ হয়েছিল 'ল্যাবরেটরি', 'আগুন', 'হোমিওপ্যাথি' ও 'জবানবন্দী' নাটক (ব্যালে-ছায়ানৃত্য, 'আবৃত্তি', বা গণসংগীতের প্রসঙ্গ এখানে স্বভাবতই আনছি না)। শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের বঞ্চনা ও শোষণের বাস্তব ছবি এই প্রথম মঞ্চে রূপায়িত হলো, একই তুলে ধরা হলো প্রতিবাদ-সংগঠন ও লড়াইয়ের প্রেরণা। প্রতিনিয়ত জীবনসংগ্রামের ছবি ও তা থেকে উত্তীর্ণ হবার আশাবাদী চেতনা দর্শকদের মধ্যে নতুন এক প্রেরণা সঞ্চারিত করলো। এবং এগুলির সার্থকতার যোগফল হিসেবেই ১৯৪৪-এ মঞ্চস্থ হলো 'নবান্ন' নাটক। এ নাটক গণমানসে বিরাট সাড়া তুলেছিল— শুধু শহুরে শিক্ষিত মানুষেরাই নয়, গ্রামেগঞ্জে সাধারণ মানুষেরাও এসব নাটক দেখে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিল। একে কমিউনিস্ট গন্ধ, তারপর এসব নাটক— ফলত বৃটিশ শাসকেরা পেছনে লেগেছিল। শুধু তাই নয়, চর্বিত চর্বণে ও অজীর্ণতায় দীর্ণ পেশাদারি ব্যবসায়িক মঞ্চ এই উদ্দীপনার জোয়ারে ভীত হয়ে গণনাট্য সংঘকে নাটকের জন্য মঞ্চ ভাড়া দিতে নানা অজুহাতে অস্বীকার করেছিল। এমন-কি শিশির ভাদুড়ীর মতো নাট্যব্যক্তিত্বও শ্রেণীস্বার্থে তাঁর মালিকানাধীন মঞ্চ দিতে অস্বীকার করেছিলেন। তবুও বাংলার নাট্য-আন্দোলনে প্রগতিশীলতার যে জোয়ার গণনাট্য সংঘ আনতে সক্ষম হয়েছিল, গণমানস থেকে তাকে মুছে ফেলা যায় নি।

কীভাবে এই অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছিল? একদল আদর্শপ্রাণ যুবকযুবতী নিয়ে নতুন ধরনের সংস্কৃতি সৃষ্টি করার জন্য অত্যন্ত সুশৃঙ্খল সংগঠন— যেখানে ব্যক্তি অপেক্ষা আদর্শ বড়ো ছিল— যেখানে ব্যবসায়িক সাফল্য অপেক্ষা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল নতুন সংস্কৃতির স্বাদ ব্যাপক মেহনতি মানুষের সামনে তুলে ধরা— এবং যেখানে অনেকেই নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে নতুন সংস্কৃতি আন্দোলনের দিশারি ছাড়া আর কিছু কল্পনা করতেও পারতো না। গণনাট্যের সবচেয়ে সফল নাটক 'নবান্ন' ধরেই আলোচনা করা যেতে পারে। পরিচালকদ্বয় (শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্য), নাট্যকার (বিজন ভট্টাচার্য), অভিনেতা-অভিনেত্রী— এদের মধ্যে একমাত্র শম্ভু মিত্রের

সামান্য পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল, বাকি সবার তা-ও ছিল না। এদের কারও কৃতিত্বই কম ছিল না, কিন্তু মূল কথা ছিল এটাই যে, একটি রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতেই নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচিত ও রচিত হয়েছিল, অভিনয়ে ব্যক্তিপ্রাধান্যের বদলে সমবেত টিমওয়ার্কের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল, আর সবচেয়ে বড়ো কথা গণনাট্যের আদর্শ ও প্রেরণা সবাইকেই উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পেরেছিল। তাই অভিজ্ঞ অভিনেতা ও গণনাট্যের বাঙলা শাখার সভাপতি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেছিলেন : ''নবান্ন' পড়ে মনেই হয় না যে এর মঞ্চোপযোগিতা থাকতে পারে। এ নাটককে রূপ দেবার সাহস ও সফলতা গণনাট্য সংঘের পক্ষেই সম্ভব। কারণ, এমন আদর্শবাদী রূপতপস্বী সমবায় কোনো ব্যবসাদারি থিয়েটারের পক্ষে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ছোট বড় বহুসংখ্যক ভূমিকা সমানভাবে প্রাণ দিয়ে অভিনয় করতে পারেন তাঁরাই, যাঁরা জানেন শুধুমাত্র জনসেবাই এর লক্ষ্য— নিজের প্রতিষ্ঠা নয়।'' আজকে গণনাট্যের ওইসব নাটক পড়ে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতা খুঁজে বের করাই যেতে পারে, কিন্তু সেই সময় বাংলার নাট্য আন্দোলনে সচেতন এক প্রগতিশীল ও গণমুখী ধারা গড়ে তোলার ব্যাপারে গণনাট্য সংঘের পথিকৃৎ ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক নেই— বিতর্ক নেই গণনাট্যের এই সাফল্যের পেছনে সাম্যবাদী মতাদর্শের ভূমিকা সম্পর্কেও। তাই 'নবান্ন'-র নাট্যকার নিজেই স্বীকার করেছেন : কমিউনিস্ট পার্টি তাঁর ''বাহ্য ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পেছনে মানসিকতার দিক দিয়ে দিব্যশক্তির কাজ করেছে'', ''কমিউনিস্ট আন্দোলনে না এলে নাট্যকার হতাম না।'' গণ আন্দোলনের সঙ্গে জীবন্ত এই যোগসূত্রই গণনাট্যের নাটকে প্রাণের স্পন্দন সঞ্চারিত করেছিল।

তিন

বাংলার নাট্য আন্দোলনে গণনাট্যের অবিস্মরণীয় ভূমিকা কিন্তু ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেনি, ১৯৪৬ থেকেই গণনাট্য সংঘের বিশেষত নাট্যশাখা স্তিমিত হয়ে পড়তে থাকে— গণনাট্য সংঘ ক্রমশ ভাঙনের পথে এগোতে থাকে। এই ভাঙনের পেছনে একই সঙ্গে কাজ করেছিল ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক কারণ। গণনাট্যের সাফল্যের পেছনে মতাদর্শগত প্রেরণা মূল ভূমিকা নিলেও অনেকেই ক্রমশ গণনাট্যের মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার মোহে আকৃষ্ট হয়ে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার দিকে বিশেষভাবে ঝুঁকে পড়তে থাকেন। তাই 'নবান্ন' নাটকে যে উঁচু মান অর্জিত হয়েছিল, তাকেই তাঁরা আঁকড়ে ধরে থাকতে চান, সেই মান নষ্ট হবে এই অজুহাতে ক্রমে 'নবান্ন'-র মঞ্চায়ন বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি শম্ভু মিত্র প্রভৃতি কয়েক জন কলকাতার বাইরে গ্রামে-গঞ্জে-মফঃস্বল শহরগুলিতে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের অনুপস্থিতিতে নাটকের উঁচু মান থাকবে না— এই নাটকের মঞ্চায়ন করতে অস্বীকার করেন। একই যুক্তিতে নতুন নাটক মঞ্চায়িত হওয়াও ক্রমশ কমে আসে। দক্ষ প্রয়োগশিল্পী ও অভিনেতা হিসেবে *নবান্ন*-র অন্যতম পরিচালক শম্ভু মিত্র যে বিপুল খ্যাতি পান, সেটাকে পাথেয় করে তিনি ব্যক্তি প্রতিষ্ঠার দিকে ঝুঁকে পড়তে থাকেন। তিনি এবং আরও অনেকেই নানা অজুহাতে গণনাট্যের নাটক করতে কলকাতার বাইরে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, যেতে চাইতেন না। বরং বোম্বাইয়ে 'ধরতি কী লাল' ও 'অন্তিম অভিলাষ' সিনেমায় অভিনয় করাটাই তাঁর কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সংগঠনের মধ্যে এসব, ও অন্যান্য কারণে, যেসব দ্বন্দ্ব সূচিত হয়, ক্রমশ তা ব্যক্তিদ্বন্দ্বে পর্যবসিত হতে থাকে। এর পরিণতিতেই অনেকেই গণনাট্যের মূল রাজনীতি বিস্মৃত হয়ে গণনাট্য ছেড়ে ব্যক্তি-প্রাধান্য-ভিত্তিক নতুন নতুন নাটকের দল গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় মত্ত হয়ে পড়েন।

রাজনৈতিক কারণেও গণনাট্যের এই ভাঙনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়ে ওঠে। কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সম্পাদক পি সি যোশী গণনাট্য সংঘের জন্ম থেকেই তার বিকাশের ব্যাপারে বিশেষ সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে তার ওপর একপেশে গুরুত্ব দিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের দ্বন্দ্বকে তিনি ও তৎকালীন পার্টি-নেতৃত্ব বৈপ্লবিক পন্থায় ব্যবহার করার লাইন তুলে ধরেননি, বরং কার্যত এক সংস্কারবাদী লাইনকেই তাঁরা অনুসরণ করেছিলেন। তাঁদের এই সংস্কারবাদী লাইন গণনাট্য সংঘের বৈপ্লবিক বিকাশকেও অনেক পরিমাণে ব্যাহত করে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব অস্বীকার করে তাঁরা বুর্জোয়া মানসিকতাবিশিষ্ট বিখ্যাত ও প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের অসমালোচনামূলকভাবে গণনাট্যের মধ্যে টেনে আনার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেন, মতাদর্শগত সংগ্রাম শিকেয় ওঠে, শ্রমিক কৃষক-মেহনতি মানুষের সংগ্রামের স্বার্থে শিল্প-সাহিত্যকে পরিচালিত করার মতাদর্শ সংগ্রামের স্বার্থে শিল্প-সাহিত্যকে পরিচালিত করার মতাদর্শ অবহেলিত হতে থাকে। মার্কসবাদী মতাদর্শভিত্তিক সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব গড়ে তোলার বদলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত কলা-শিল্পগুরুকেই যোশী গণনাট্য কর্মীদের 'পলিটব্যুরো' বলে ঘোষণা করেন। ভারতের ব্যাপক জনসাধারণ যেখানে থাকেন, সেই গ্রামাঞ্চলে গণনাট্যের প্রসার ঘটানোর শপথ নিয়ে গণনাট্যসংঘ যাত্রা শুরু করেছিল, কিন্তু ক্রমে তাদের কাছ থেকে সংগঠনকে সরিয়ে এনে শহরাঞ্চলে নাটক-গান পরিবেশন করার ওপরেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতে থাকে। ব্যাপক মেহনতি মানুষের ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক মোর্চা গড়ে তোলার দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার যে প্রবণতা যোশীর নেতৃত্বে সূচিত হয়, ১৯৪৮-এ দ্বিতীয় পার্টি-কংগ্রেসে তাঁর বদলে পার্টির নতুন সম্পাদক রণদিভে'র উগ্র 'বাম' লাইন সেই প্রবণতাকেই আরও এগিয়ে নিয়ে যায়— সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্তবাদ বিরোধী সাংস্কৃতিক মোর্চা গড়ার কর্মসূচি পর্যন্ত ১৯৪৯-এ এলাহাবাদে গণনাট্য সংঘের ষষ্ঠ সম্মেলনে পরিত্যক্ত হয়। পরবর্তী কালে ১৯৫৩-তে বোম্বাইয়ে গণনাট্যের সপ্তম সম্মেলনে এই কর্মসূচি আবার গৃহীত হলেও শ্রমিকশ্রেণীর

সাংস্কৃতিক মতাদর্শের নেতৃত্বকারী ভূমিকাকে কার্যত অস্বীকার করা হয়। পার্টির নতুন সম্পাদক অজয় ঘোষ নিদান দেন : শিল্প-সাহিত্য প্রগতিশীল, না প্রতিক্রিয়াশীল, তা বিচার করার দরকার নেই— দর্শকদের যেটা ভালো লাগবে, সেটাই করতে হবে!

পার্টি-নেতৃত্বের এই মতাদর্শগত বিচ্যুতির পাশাপাশি সে সময় গণনাট্যসংঘের ওপর ধারাবাহিক ও তীব্রভাবে নেমে আসতে শুরু করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ এবং তার সঙ্গে ভাগ-বাটোয়ারা করে দ্বিখণ্ডিত ভারতে মসনদ দখলের স্বপ্নে মশগুল কংগ্রেস-কর্মীদের বিরোধিতা ও গুন্ডামি। পার্টি অফিসের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে গণনাট্য সংঘের অফিসেও হাঙ্গামা, বোমাবাজি ও খুনের মহড়া। ১৯৪৭-এ কংগ্রেস ক্ষমতার গদিতে বসেই গণনাট্য সংঘকে গুঁড়িয়ে ফেলার কর্মসূচি নেয়। ১৯৪৮-এ কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করা সঙ্গে সঙ্গে গণনাট্য সংঘকেও কার্যত নিষিদ্ধ করা হয়, তাদের ওপর হামলা চলে, গণনাট্য প্রযোজিত ৫৯টি নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৪৮-এ ডিক্সন লেনে গণনাট্যের সভায় বোমা ফাটিয়ে দু'জন কর্মীকে খুন করা হয়। এক কথায়, গণনাট্যকে স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধ্বংস করার সর্বাত্মক এক প্রচেষ্টা চলে।

রাজনৈতিক নেতৃত্বের মতাদর্শগত বিচ্যুতি ও সংগঠনের ওপর ধারাবাহিক অক্রমণে এই পটভূমিকাতেই গণনাট্য সংঘের মাধ্যমে পাদপ্রদীপের সামনে এসে খ্যাতি-অর্জন-করা আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী শিল্পীরা দলে দলে গণনাট্য ছেড়ে বেরিয়ে যেতে থাকেন নানা অজুহাত তুলে। ১৯৪৮-এ শম্ভু মিত্র গঠন করেন 'বহুরূপী', মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, তৃপ্তি মিত্র প্রভৃতি তাতে যোগ দেন। বিজন ভট্টাচার্য গড়ে তোলেন ক্যালকাটা থিয়েটার। ক্রমে ক্রমে গড়ে ওঠে রূপকার, লিটল থিয়েটার, প্রান্তিক, শৌভনিক, অনুশীলন প্রভৃতি নাটকের দল। এভাবেই ক্রমশ গণনাট্যের স্থান দখল করতে থাকে 'নবনাট্য'। গণনাট্য সংঘের পতাকাতলে নাটকের প্রযোজনা ক্রমশ কমতে থাকে। ১৯৪৮-এ গণনাট্য থেকে বেরিয়ে এসে 'বহুরূপী' গঠনের মধ্যে দিয়ে গণনাট্যের ভাঙনের সূচনা হলেও, অন্তত কয়েক বছর পর্যন্ত, গণনাট্যের সঙ্গে 'বহুরূপী'-র যোগসূত্র বজায় ছিল। কমিউনিস্টদের গণনাট্যের ব্যাপারে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের কারণেই গণনাট্য ভেঙে যায় বলে শম্ভু মিত্র সহ কয়েকজন একদা-গণনাট্যকর্মী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অভিযোগ তুলেছেন, তা যে মূলত একটি অজুহাত ছিল, এই তথ্যটিই তার প্রমাণ বহন করছে। তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল যখন পার্লামেন্ট নির্বাচনের প্রচারসভায় স্বয়ং শম্ভু মিত্র গণনাট্য আন্দোলনের আর এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের বিখ্যাত 'মধু বংশীর গলি' কবিতাটি আবৃত্তি করে লোক জোটাবার দায়িত্ব নেন।

গণনাট্যের ভাঙনের প্রক্রিয়ায় ১৯৪৮ পরবর্তীকালে যে অসংখ্য নাট্যদল গড়ে ওঠে, সেগুলিই ক্রমে 'নবনাট্য' আন্দোলন নামে পরিচিত হতে থাকে। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে গণনাট্যের সঙ্গে সঙ্গে পেশাদার নাট্যশালাগুলিতেও সংকট দেখা দেয়, এবং তার পটভূমিকায় সংকট-মোচনের আশায় শিশির ভাদুড়ী, তাঁর বন্ধু ও উদারনৈতিক কংগ্রেস-নেতা নির্মলকুমার চন্দ্র, অহীন্দ্র চৌধুরী, শচীন সেনগুপ্ত, তুলসী লাহিড়ী প্রভৃতির সঙ্গে চল্লিশটি নাট্যদল ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। চারুপ্রকাশ ঘোষ, সুধী প্রধান প্রভৃতি গণনাট্যের অনেক সংগঠকও তাতে সামিল হয়েছিলেন। এই বঙ্গীয় নাট্যসম্মেলনের ঘোষণাপত্রে স্পষ্টতই গণনাট্যের আদর্শের প্রভাব ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ টেকেনি। তবু সেসময় জীবনমুখী নাটক মঞ্চস্থ করার একটি প্রচেষ্টা অনেক নাট্যদলের মধ্যেই ধরা পড়ে। ভামা গণনাট্যের 'রাহুমুক্ত' যাত্রা, বহুরূপী-র 'পথিক' ও 'ছেঁড়া তার', উত্তরসারথি-র 'নতুন ইহুদী', ক্রান্তি শিল্পীসংঘের 'মহুয়া' ও 'মহেশ', নাট্যচক্রের 'নীলদর্পণ', অনুশীলনের 'দলিল' ও 'জুলিয়াস ফুচিক' প্রভৃতি নাটক কার্যত ছিল গণনাট্যের ধারাকেই বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা। সেই অর্থে ব্যক্তি প্রাধান্য ভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও নবনাট্যের দলগুলি সূচনাতে গণনাট্যের মূল আদর্শকে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও টিকিয়ে রাখার কিছু চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু গণআন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্নতা ক্রমশ এদের রাজনৈতিক চেতনার ভিতকে দুর্বল করে ফেলে, রাজনৈতিক চেতনা এড়িয়ে গিয়ে, নাটকের আঙ্গিক ও কলাকৌশলের ওপর প্রধান জোর দিয়ে। প্রথমদিকে মোটামুটি জীবনধর্মী, এবং পরবর্তীকালে ধনতান্ত্রিক মূল্যবোধবিশিষ্ট, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, নেতিমূলক, জীবনবিমুখ ও বিমূর্ত নাটক নবনাট্য আন্দোলনে ক্রমশ প্রাধান্য বিস্তার করে। মূলত কলকাতা বা মফঃস্বল শহরকেন্দ্রিক এইসব নাট্যদল শিল্পগুণ ও আঙ্গিকের ব্যাপারে বহুক্ষেত্রে উন্নত মানের পরিচয় দিলেও, সেসব নাটক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল অতীব ব্যয়বহুল, গ্রামেগঞ্জে অভিনয়ের অনুপযোগী। তার ওপর ব্যক্তি প্রতিষ্ঠার ও খ্যাতি অর্জনের অতিরিক্ত মোহে এসব নাট্যদলের প্রধান ব্যক্তিরা অনেকেই সিনেমা বা পেশাদারি থিয়েটারে যুক্ত হওয়ার ফলে তাদের নাট্য-প্রযোজনাগুলিও ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলত এক পা পেশাদারি থিয়েটার-সিনেমার দিকে, এবং অন্য পা ভালো নাটকের দিকে স্থাপিত করে এরা শহুরে শিক্ষিত মধ্য ও উচ্চবিত্ত দর্শকদের মধ্যেই ঘুরপাক খেতে থাকে। সূচনাতে অস্পষ্টভাবে গণনাট্যের আদর্শের কথা বলে যাত্রা শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত এসব নাট্যদলের অধিকাংশই বাস্তব জীবন-সংগ্রামের থেকে মূলত এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপে অবস্থান করতে থাকে।

পঞ্চাশের দশকের শেষদিক থেকে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দুই লাইনের দ্বন্দ্বের তীব্রতা, ১৯৫৯-৬২-তে ভারতের চীন যুদ্ধ এবং শেষ পর্যন্ত পার্টির ভাঙন একদিকে যেমন গণনাট্য সংঘের মধ্যে ক্রমশ সরকারি স্বীকৃতি ও প্রসাদ পাবার প্রবণতাকে জোরদার করে তোলে, অন্যদিকে তেমন দেশজুড়ে চীন-তথা-সমাজতন্ত্রবিরোধী উগ্র জাতীয়তাবাদের বন্যায় ভেসে গিয়ে একদা গণনাট্যের শিল্পীরা অনেকেই চরম প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থানে চলে যায়। নবনাট্য আন্দোলনের অনেক দল শুধু উগ্র

জাতীয়তাবাদী নাটক মঞ্চস্থ করেই ক্ষান্ত হয় না, সরকারের মূলত জনবিরোধী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচির পরোক্ষ প্রচারের কাজেও নাটককে ব্যবহার করতে থাকে, মূলত একদা গণনাট্য-শিল্পীদের নিয়েই গড়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা। পেশাদার মঞ্চে ব্যবসায়িক মানসিকতার কাছে আত্মসমর্পণের প্রবণতা জোরদার হয়ে ওঠে।

চার

ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে এই উল্টোরথের পালার বিরুদ্ধে ক্রমবিকাশমান গণআন্দোলনের প্রেরণায় নতুন করে যখন প্রগতিশীল নাট্যআন্দোলনের সূচনা শুরু হয়, গণনাট্যের ধারায় নতুন প্রাণসঞ্চারের লক্ষণ ধরা পড়ে। মিনার্ভায় লিটল থিয়েটারে 'কল্লোল' নাটককে কেন্দ্র করে এই সব প্রচেষ্টা দানা বাঁধতে শুরু করে। তখন নবনাট্য আন্দোলনের পুরোধা শম্ভু মিত্র প্রভৃতি পেশাদার মঞ্চ ও অবক্ষয়ের দিকে দ্রুত ধাবমান 'নবনাট্য' থেকে পৃথক এক নাট্যআন্দোলনের স্লোগান হাজির করেন— নবনাট্য থেকে এভাবেই জন্ম নেয় 'সৎনাট্য' আন্দোলন। এই প্রক্রিয়ারই তাত্ত্বিক রূপ এবং 'সৎনাট্য আন্দোলন কার্যত বাস্তবাদী নাট্য-দৃষ্টিভঙ্গিরই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল রাজনীতি বিবর্জিত বিশুদ্ধ শিক্ষা হিসেবে নাটককে তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে। গণনাট্যের আদর্শ থেকে সরে আসার যে প্রক্রিয়া নবনাট্য আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল, সেই প্রক্রিয়া এভাবেই উপনীত হলো একেবারে সরাসরি সেই আদর্শের বিরোধিতার বিপরীত মেরুতে। নবনাট্যের পুরোধা ব্যক্তিদের সরকারি সম্মান, পুরস্কার ও শিরোপা দেবার যে প্রক্রিয়া আগেই স্বাভাবিকভাবে শুরু হয়েছিল, সেই প্রক্রিয়া এর ফলে আরও জোরদার হয়ে উঠেছিল। প্রতিক্রিয়ার শিবির "গণনাট্যের রাজনৈতিক নাগপাশ থেকে নাটককে নবনাট্যের মুক্তিতীর্থে পৌছে" দেবার জন্য শম্ভু মিত্রকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁকে 'আচার্য' বলে অভিহিত করলো।

আগেই বলেছি, গণনাট্য থেকে নবনাট্য এবং নবনাট্য থেকে সৎনাট্যের পথে বাংলা নাটকের এই অবক্ষয়ী যাত্রা ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে শুরু করেছিল। গণআন্দোলন সেসময় তীব্র থেকে হয়ে উঠেছিল, এবং সেই গণসংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে নাটকে জীবনের নতুন স্পন্দন ধরা পড়তে শুরু করেছিল। সেই আন্দোলনের প্রেরণায় গণনাট্যের প্রায় বিলুপ্ত ধারায় সূচিত হচ্ছিল নবজীবনের লক্ষণ। এই প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে নতুন ক'রে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল জীবনমুখী নাট্যধারাকে ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ ক'রে তোলার জন্য। ১৯৬৭-তে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনও এই ধারার সংহতির পক্ষে কিছুটা ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় সংসদীয় পথে কমিউনিস্ট পার্টির পদক্ষেপের মধ্যে স্থিতাবস্থার সঙ্গে সমঝোতার যে প্রাথমিক প্রবণতা নিহিত ছিল, সেবছরই সংসদীয় পথ বর্জন ক'রে বিপ্লবী কৃষক আন্দোলনের সূচনা হিসেবে নকশালবাড়ীতে ধ্বনিত বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ সাময়িকভাবে হলেও সেই প্রবণতার বিরুদ্ধে একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত শক্তির বিকাশ ঘটিয়েছিল। ষাটের দশকের শেষ দিকে এরই পরিণতিতে নবনাট্য বা সৎনাট্যের পতাকাকে অস্বীকার ক'রে স্বতন্ত্রভাবে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল নতুন নতুন নাটকের দল। 'মারীচ সংবাদ', 'চাকভাঙা মধু', 'কলকাতার হ্যামলেট', 'লাল লণ্ঠন', 'প্রবাহ' প্রভৃতি নাটকের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও গণনাট্যের নাটকের ধারাকে এই নতুন করে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা ধরা পড়েছিল। এভাবেই জন্ম নিয়েছিল গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন। ১৯৭৫-এ জরুরি অবস্থা ঘোষণার আগে পর্যন্ত এই ধরনের নাট্য প্রচেষ্টাগুলি বাংলার নাট্য আন্দোলনে নতুন ক'রে জীবনমুখী চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছিল।

কিন্তু এই গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনও নাটককে গণ-সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার ক'রে ধারাবাহিক এক ঐক্যবদ্ধ ও সংহত সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে উঠতে পারে নি। একদিকে নকশালবাড়ী আন্দোলনের গণ-আন্দোলন বর্জনের লাইন এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঠিক দিক্‌নির্দেশ নীতি ও কৌশল প্রণয়নে ব্যর্থতা এই গ্রুপ-থিয়েটার আন্দোলনের মতাদর্শগত ভিত্তি তৈরি করে দিতে পারে নি। অন্যদিকে ১৯৭৭ থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় স্থায়ীভাবে বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিষ্ঠা কার্যত গণ-আন্দোলন বর্জন এবং স্থিতাবস্থার সঙ্গে অর্থনৈতিক আপোষের যে প্রবণতার জন্ম দিয়েছিল, তার পরিণতিতে গ্রুপ থিয়েটারগুলির পুরোধাদের এস্টাবলিশমেন্টমুখী ব্যক্তিগত বা গ্রুপগত আত্মপ্রতিষ্ঠার সুবিধাবাদী লাইনকে জোরদার করে তুলেছিল। ১৯৭৭ পরবর্তী অধিকাংশ নাটকে এই লাইনের প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল। বাস্তবে গণআন্দোলনের পটভূমিকার অনুপস্থিতি এবং তা গড়ে তোলার ব্যাপারে কার্যত অনীহা ফর্মূলা-বাঁধা স্লোগান দিয়ে (সাধারণত শেষ দৃশ্যে লাল আলো ফেলে বা লাল পতাকা আন্দোলিত করে!) দায়িত্ব শেষ করায় পর্যবসিত হলো। প্রবহমান জীবন থেকে নাটকের রসদ গ্রহণ ক'রে বাস্তব সংগ্রামের প্রেরণা সঞ্চার করার উদ্দেশ্যে নাটক মঞ্চায়ন করার পথ ছেড়ে ব্রেখট্ প্রভৃতি বিদেশি প্রগতিশীল নাট্যকারদের নাটকের অনুবাদ বা ভারতীয়করণের প্রবণতা স্বভাবতই জোরদার হয়ে উঠলো (সে প্রসঙ্গে অশোক মিত্র সঠিকভাবেই বলেছেন : "ব্রেখট্ প্রভৃতির নাটক মঞ্চায়ন সুবিধেবাদী এক পলায়নী মনোবৃত্তির পথ প্রশস্ত করেছে... আমাদের বাস্তব সংগ্রামের সাহায্য করার জন্য বিদেশিদের ওপর এই নির্ভরতা উল্টোদিক থেকে আরেক ধরনের নয়া-উপনিবেশবাদী মানসিকতার পরিচয় বহন করছে")। গ্রুপ-থিয়েটারগুলির সক্রিয়তা ও প্রভাব লক্ষ্য করে নির্বাচনী স্বার্থে তাদের ব্যবহার করার জন্য সিপিএম তথা বামফ্রন্ট সরকার ঢালাওভাবে তাদেরকে অর্থ সাহায্য, স্বীকৃতি ও আমলা হবার সুযোগ ক'রে দিয়েছে— তারাও তা গ্রহণ ক'রে আখের গুছিয়ে নেবার প্রতিযোগিতায় মুক্তকচ্ছ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বামফ্রন্ট সরকার বা তার প্রধান শরিকদলের সমর্থনপুষ্ট সীমিত যেকোনো

আন্দোলন বা কর্মসূচিতে তারা সামিল হচ্ছে, এবং সরকারের বিরোধী রাজনৈতিক বক্তব্য বা যুক্তিযুক্ত সমালোচনা উপস্থাপিত করতে গেলে "পা জড়িয়ে ধরছে ভয়"। এরাজ্যে দিনের পর দিন অসংখ্য কারখানা বন্ধ হয়ে যাবার ফলে হাজার হাজার শ্রমিক অনাহারে অর্ধাহারে ধুঁকছে, কৃষকরা জলের দাবিতে আন্দোলন করতে গেলে পুলিশ গুলি চালাচ্ছে, দেড়শোর বেশি লোক পুলিশি হেফাজতে প্রাণ হারাচ্ছে, বিভিন্ন কায়দায় গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হচ্ছে— তবু গ্রুপ-থিয়েটারগুলি তা নিয়ে নাটক প্রযোজনা করে সরকারি দলের বিরাগভাজন হতে চাইছে না। ফলত, এরাজ্যে গত দেড় দশকে আপাতদৃষ্টিতে নাট্যসংস্কৃতির পালে নয়া বাতাস লাগলেও এবং সেই বাতাসের প্রেরণায় আকাডেমি-ওয়ার্কশপ-সেমিনার ইত্যাদির বাড়বাড়ন্ত হলেও সেসব গণনাট্যের মতাদর্শকে প্রসারিত করছে না। দেশ-আনন্দবাজার গোষ্ঠী যেমন আজ পশ্চিমবঙ্গে বাজারি সংস্কৃতিকে লালনপালন ও নিয়ন্ত্রণ করছে, সিপিএম ঠিক তেমনই ইজারা নিয়েছে এখানকার প্রগতিশীল সংস্কৃতি আন্দোলনের— যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হোপ-৮৬ থেকে শুরু ক'রে আনুষ্ঠানিক সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কর্মসূচি, নির্বাচনী প্রচার, সফদার হাসমি স্মরণ প্রভৃতি সমস্ত কিছুই। এসবের মধ্যে নিজেদের ব্যক্তিগত, গ্রুপগত ও শ্রেণী-স্বার্থে কোনো না কোনোভাবে সামিল হচ্ছে গ্রুপ-থিয়েটারগুলি, অতীতে বা এমনকি এখনও একই সঙ্গে ম্যাক্সমুলার ভবন, ফোর্ড ফাউন্ডেশন বা আমেরিকান সেন্টারের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও আর্থিক সম্পর্কও সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রগতি আন্দোলনের পথে বাধা সৃষ্টি করছে না। প্রতিক্রিয়ার শিবির যাঁকে "গণনাট্যের রাজনৈতিক নাগপাশ থেকে নাটককে মুক্ত" করার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছিল, সেই শম্ভু মিত্র আজ অনেক গ্রুপ-থিয়েটারেরই ঘোষিত মডেল, এমনকি বামফ্রন্ট সরকার পর্যন্ত তাঁকে সরকারি নাট্য আকাডেমির সভাপতি পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে দ্বিধা করেন নি। গণ-আন্দোলনবিমুখ এবং এ রাজ্যে স্থিতাবস্থার সাড়ে তিন বছর ধরে ধারক ও বাহক বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে গ্রুপ-থিয়েটার আন্দোলনের এই কার্যত পরিপূরক অবস্থান স্বভাবতই গণনাট্যের মূলত মতাদর্শের শবদেহের ওপর দাঁড়িয়েই গৃহীত হয়েছে। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে আজ যে মতাদর্শগত সংকট বিরাজ করছে, তার পটভূমিকায় গ্রুপ-থিয়েটারগুলির বর্তমান অবক্ষয় ও সংকট এক তীব্র আকার ধারণ করেছে। গ্রুপগুলি প্রতিবাদী মানসিকতা কার্যত হারিয়ে ফেলেছে, পারস্পরিক বা আভ্যন্তরীণ মতাদর্শগত সংগ্রামের কোনো জায়গা থাকছে না। প্রতিবাদী নাটকের মাধ্যমে জনগণের চেতনা বাড়িয়ে তুলবার কাজে যারা ব্রতী হয়েছিলেন, এমনকি এখনও প্রধানত দেশের বাস্তবতা-বর্জিত ফর্মুলা-বাঁধা প্রতিবাদী কণ্ঠ যারা নিজেদের নাটকে সোচ্চার করে তোলেন, তাঁরা নিজেরাই আজ মূলত প্রতিবাদ করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলেছেন। এটাই সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের গ্রুপ-থিয়েটার আন্দোলনের সবচেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডি।

গভীরভাবে বিবেচনা করতে গেলে গ্রুপ-থিয়েটারের এই পরিণতি কিন্তু অনিবার্যই ছিল। ষাট ও সত্তরের দশকের গণআন্দোলনের জোয়ারের পটভূমিকায় এগুলি জন্ম নিলেও, এবং গণনাট্যের অতীত ঐতিহ্যকে সামনে রেখে সেগুলি যাত্রা শুরু করলেও দৃঢ় কোনো মতাদর্শগত ভিত্তি এগুলির তো ছিলই না, বরং ১৯৪৮ থেকে নবনাট্যের দলগুলির সাংগঠনিক মডেলটিই মূলত এগুলির মধ্যে প্রথম থেকে অনুসৃত হয়েছিল। এবং সে মডেলটি পুরোপুরিই ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক— সমষ্টিগত চেতনার কথা বলা হলেও কার্যত তার বিপরীত প্রবণতাই তার মধ্যে অনেক বেশি জোরদার ছিল। তার ফলে একের পর এক প্রায় সমস্ত গ্রুপ-থিয়েটারেই চলেছে ভাঙনের এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এবং এসব ভাঙনের পেছনে মূলত কোনো মতাদর্শগত প্রশ্ন আগেও ছিল না, আজও নেই। ভাঙনের ব্যক্তিকেন্দ্রিক এই প্রবণতা আর যাই করুক, ঐক্যবদ্ধ গণনাট্য আন্দোলনের বিকাশ নিশ্চয়ই ঘটাতে পারে না!

অন্যদিকে দৃঢ় মতাদর্শগত ভিত্তির অনুপস্থিতিতে ভাসা-ভাসা রাজনৈতিক চেতনা প্রাধান্য পেয়েছে, এবং মূল জোরটা পড়েছে আঙ্গিক, কলাকৌশল ও অভিনয়ের ওপরে। নিঃসন্দেহে এসব দিকে গ্রুপ থিয়েটারের যুগে বিশেষ উন্নতমান অর্জিত হয়েছে, কিন্তু জীবনের সঙ্গে গভীর সংযোগের অভাবে সেগুলি প্রকৃতপক্ষে অন্তঃসারশূন্য সুন্দর পুতুল হয়েছে, প্রাণের স্পন্দন তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধরা পড়েনি। সবচেয়ে বড়ো কথা, আঙ্গিক সর্বস্বতার ওপর এই মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব অনেক ক্ষেত্রেই নাটককে সাধারণ দর্শকের কাছ দুর্বোধ্য করে তুলেছে, গ্রহণযোগ্যতায় সেগুলি সীমাবদ্ধ থেকে গেছে মূলত শহরের শিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে। এই আঙ্গিক-সর্বস্বতা ও অতিরিক্ত ব্যয়বাহুল্যের কারণে গ্রামে-গঞ্জে হাটে-বাজারে সেগুলি মঞ্চস্থ করাও প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে নাটকে শ্রমিক-কৃষক ও ব্যাপক মেহনতি মানুষের কথা আওড়ালেও তাদের কাছে এইসব নাটক মূলত পৌঁছোতে পারেনি। এদিক দিয়েও গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন মাও সে-তুঙের ইয়েনান ভাষণে বা রম্যাঁ রঁল্যার লেখায় বিধৃত গণনাট্যের স্বীকৃত লক্ষণগুলির পরিচয় তুলে ধরতে পারেনি।

আর সবচেয়ে যেটা ক্ষতিকর হয়েছে, যেকথা আগেই বলেছি, সেটা হচ্ছে গ্রুপ থিয়েটারে প্রথম পা-টি রেখে দ্বিতীয় পা-টি আত্মপ্রতিষ্ঠা ও ব্যক্তিস্বার্থসিদ্ধির পথে বাড়ানোর ধারাবাহিক প্রবণতা। পেশাদারি নাটকের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে আর্থিক স্বার্থসিদ্ধির সুযোগও খুলে গেছে। ফলে, টিভি, সিনেমা, বাণিজ্যিক যাত্রা ও থিয়েটারে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনুদান ও পুরস্কার, কিংবা নাটক মঞ্চস্থ করার মাধ্যমে গ্রুপগত বা ব্যক্তিগত অর্থোপার্জনের নানাবিধ পথ খুলে গেছে গ্রুপ থিয়েটারে খ্যাতনামাদের কাছে। এতো সুযোগ-সুবিধে প্রতিষ্ঠার হাতছানি গ্রুপ থিয়েটারের কর্মীদের মতাদর্শ চিন্তাধারাকে কার্যত

অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। ফলে গ্রুপ থিয়েটার আজ আর কার্যত আন্দোলনের নাম নয়— এটা আখের গুছিয়ে নেবার প্রতিযোগিতায় পর্যবসিত হয়েছে। ব্যতিক্রম হয়ত কিছু আছে, কিন্তু প্রথমত দৃঢ় মতাদর্শগত ভিত্তির অনুপস্থিতিতে কতদিন সেগুলি গণচরিত্র বজায় রাখতে পারবে সেটা একটা বড়ো প্রশ্ন, এবং দ্বিতীয়ত, ব্যতিক্রম দিয়ে কোনো নিয়ম নির্ধারিত হয় না।

গণনাট্যের পথ থেকে গ্রুপ-থিয়েটারের এই মৌলিক বিচ্যুতি প্রসঙ্গে দু'জন প্রতিভাবান শিল্পীর হতাশ মূল্যায়ন আমাদের আলোচনার মূল বক্তব্যকেই সমর্থন করে। গণনাট্য ভেঙে গঠিত প্রথম নাট্যদল 'বহুরূপী'-র অগ্রণী শিল্পী তৃপ্তি মিত্র স্বীকার করেছেন : "আদর্শ নয়, দল ভেঙে যাচ্ছে ব্যক্তিস্বার্থের কারণে— দুটো ব্যক্তিত্বের সংঘাতে। যেন-তেন-প্রকারে মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়— নেতা হতে হবে। গ্রুপ থিয়েটারের উদ্দেশ্যই তাই আজ ব্যর্থ। গ্রুপের নয়, থিয়েটার এখন দলনেতার। আগেকার সেই সাধনা নেই। আজ সহজে বাজিমাৎ করতে চাই আমরা সকলে। সরকারি অনুদান, পুরস্কার— এসবের জন্য আমরা আজ লালায়িত। আমরা আজ আদর্শচ্যুত— তাই আজ আমাদের নাটকের এই অবস্থা।" তৃপ্তি মিত্রের এই বক্তব্যকেই আরও তীব্র ভাষায় তুলে ধরেছেন আজকের গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের আরেকজন অগ্রণী ব্যক্তিত্ব মনোজ মিত্র : "গণনাট্য সংঘ আমাদের একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়ে গেছে আর আমরা বুঝতে পেরে গেছি, কী জিনিস দিলে মানুষ নেবে, নাটকে কী জিনিস থাকলে তা বহু লোককে টানবে, বহু লোকের বাহবা কুড়োনো যাবে। তাতে আমরা বিশ্বাসী হই বা না হই, তাকে আমরা চিনি বা না চিনি। আমরা ছক জানি, আর জানি তত্ত্ব। এ দুটোকে আমরা মিলিয়ে ছেড়ে দিই। শিল্প সম্পর্কে অনেক মতবাদ আছে। কিন্তু তা যে একটা চালাকি সেকথা আমরা ছাড়া বোধহয় আর কেউ জানে না। ফর্মের ক্ষেত্রেও আমরা চালাকি খাটাচ্ছি। পাশাপাশি কনটেন্টের ক্ষেত্রেও তা চালিয়ে যাচ্ছি। গণনাট্য সংঘ যে ভিত্তি স্থাপন করেছিল, যাদের আমরা আমাদের আদর্শ, আমাদের পূর্বসূরী বলে মনে করি— নিজেদের সঙ্গে ছলনা করেই আমরা তাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছি।"

পাঁচ

ধৈর্য ধরে যাঁরা এতোক্ষণ এই নিবন্ধটি পড়েছেন, একটা যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন তাঁরা তুলতেই পারেন : সুধী প্রধানের জন্মশতবর্ষে তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে এতোক্ষণ ধরে কার্যত বাংলা নাটকের এই বিস্তৃত ইতিহাস লেখার যৌক্তিকতা কী? আমার বিনীত উত্তর একটাই : সুধী প্রধানের বহু বক্তব্য বা দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আমার দ্বিমত থাকলেও, এই ইতিহাসের মূল দৃষ্টিভঙ্গিটি মূলত পেয়েছি সুধী প্রধানেরই বিভিন্ন সময়ের অসংখ্য গ্রন্থ, আলোচনা ও প্রবন্ধ থেকে। এই পটভূমিকার প্রেক্ষিতেই এবার এই প্রক্রিয়ায় তাঁর সামগ্রিক ও ধারাবাহিক অবস্থান নিয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু আলোচনায় আমরা আসবো।

প্রথমত, আগেই বলেছি, ১৯৪০-এর দশকে সুধী প্রধান ছিলেন বাংলায় গণনাট্য সংঘের পার্টি-সংগঠক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। ফলত, সে সময়ে পার্টি-লাইনের গুরুতর বিচ্যুতিগুলি সম্পর্কে তাঁর দায়িত্বের কথাও অস্বীকার করার যুক্তি নেই। সেসময়ে গণনাট্যের ক্ষেত্রে, আমরা আগেই দেখেছি, মূল ত্রুটিগুলির মধ্যে ছিল ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার যৌথ দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে মৌলিক বিচ্যুতি— যার পরিণতিতে পার্টি তখন একপেশেভাবে 'জনযুদ্ধের লাইন' অনুসরণ করে শুধুমাত্র ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করেছে এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, এমনকি শ্রমিকদের বা কৃষকদের ন্যূনতম দাবিদাওয়ার আন্দোলন করা পর্যন্ত বাস্তবত নিষিদ্ধ করে দিয়েছে; ঐতিহাসিক '৪২-এর আন্দোলন'-এর বিরোধিতা করেছে; ফ্যাসিস্ট জার্মানি বা জাপানের সহায়তায় সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে সুভাষচন্দ্র বসুর অনুসৃত ভ্রান্ত লাইনের বিরোধিতা করতে গিয়ে তাঁর বিতর্কাতীত দেশপ্রেমিক চরিত্রকে অস্বীকার করে এবং তাঁকে 'তোজোর দালাল' হিসেবে আক্রমণ করে দেশের ব্যাপক মানুষের অনুভূতিকে জঘন্যভাবে আহত করেছে। একইভাবে গণনাট্য সংঘের অনুসরণীয় সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিগড়ে তোলার বদলে বারবার দক্ষিণপন্থী বা 'বামপন্থী' বিচ্যুতির পরিচয় দিয়েছে। পরবর্তীকালে প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ ও সুধী প্রধানের নিজের লেখা থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে যে এগুলির প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি পার্টির ভুল লাইনের সমালোচনা করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পার্টি-নেতৃত্বের ভুল লাইন মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, মতাদর্শগত ক্ষেত্রে গণনাট্যের তৎকালীন অনেক অগ্রণী ব্যক্তিত্বের ভ্রান্ত লাইনের বিরুদ্ধে দৃঢ় লড়াই চালালেও, শিল্পী হিসেবে তাঁদের বিশেষ কৃতিত্ব বা বহু সময়ের ইতিবাচক ভূমিকাকে স্বীকার করতে কিংবা সেগুলি তুলে ধরতে সামান্য দ্বিধাও দেখান নি। এঁদের মধ্যে যেমন ছিলেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো প্রগতি আন্দোলনের একদা-সাথী অগ্রণী সাহিত্যিক, ঠিক তেমনি শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য,সলিল চৌধুরী, উৎপল দত্তের মতো একদা-সাথী অগ্রণী নাট্য-ব্যক্তিত্ব বা সঙ্গীতশিল্পী। গণনাট্য সংঘের সঠিক লাইন কী হবে, তা নিয়ে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর বিতর্ক এক সময় প্রচণ্ড ঝড় তুলেছিল, তবু হেমাঙ্গদার শিল্পী হিসেবে মহত্বের স্বীকৃতি দিতে তিনি কখনও পরাঙ্মুখ হন নি।

তৃতীয়ত, ১৯৪৮ সালে রণদিভের চরম 'বাম' লাইনের অন্যতম প্রবক্তা ভবানী সেন চরম মার্কস্‌বাদ-বিরোধী অবস্থান নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে তীব্র আক্রমণ করেন (পরবর্তীকালে তিনি অবশ্য তাঁর সেই অবস্থান পুরোপুরি ত্যাগ করেছিলেন)। অনেকের সেটা মনঃপূত না হলেও তখন কাপুরুষতার পরিচয় দিয়ে সুবিধেজনকভাবে নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন। সুধী প্রধান তখনই তার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন, এবং সেজন্য

তাঁকে পার্টি থেকে তখন বহিষ্কার পর্যন্ত করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে তাঁকে পার্টি-সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা হলেও, ক্রমাগত ও ধারাবাহিক বিচ্যুতির কারণে ১৯৫০ সালের পর আর তিনি সদস্যপদ গ্রহণ করেন নি। এদিকে গণনাট্য সংঘও নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে ক্রমশ পার্টির এক দিশাহীন শাখা-সংগঠনে পরিণত হলে, ১৯৫৮তে গণনাট্য সংঘের সদস্যপদ থেকেও তিনি পদত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁর প্রগতিশীল ভূমিকা তিনি কোনোদিন পরিত্যাগ করেন নি।

চতুর্থত, পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। সরকার তাঁকে লোকসংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি পদে আসীন করলে তিনি সাগ্রহে সেই দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে আসেন। সত্তরোর্ধ বয়সেও এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, সেটা সবার বিতর্কাতীত শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। উল্লেখ্য যে, অনেক সিপিআই(এম)-সমালোচক যোগ্য ব্যক্তিকেও সেই কাজে টেনে নিতে বা দায়িত্ব দিতে তিনি দ্বিধা দেখান নি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেই বামফ্রন্ট সরকারই যখন গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর আক্রমণ শুরু করে, বিশেষত 'হোপ-৮১' জাতীয় চরম অপ-সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে শুরু করে, তখন থেকেই তিনি সে সবের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে তীব্র সমালোচনা করতে এগিয়ে আসেন। শুধু তাই নয়, ১৯৯৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার যখন মহাধুমধাম করে গণনাট্য সংঘের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে তাঁকে সম্বর্ধনা দেবার প্রস্তাব করে, তখন প্রচণ্ড সমালোচনা করে তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর এই সম্পর্কিত বক্তব্য তখন '*অনীক*'-এ প্রকাশিতও হয়েছিল।

পঞ্চমত, সুধী প্রধানের একটি অবিস্মরণীয় কাজ ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রায় সমস্ত দলিল প্রচণ্ড অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে সংগ্রহ করে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ইতিহাস প্রণয়ন। এই কঠিন দায়িত্বটি পালন করতে গিয়ে তিনি শুধু গণনাট্য সংঘ নয়, ১৯৩০-এর দশক থেকে ভারতে গড়ে ওঠা গণমুখী প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সামগ্রিক ইতিহাসকেই সংকলিত করেছেন। শুধুমাত্র এই কাজটির জন্যই আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মীরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন।

ষষ্ঠত, তাঁর আরও দু'টি ভূমিকার কথাও উল্লেখ করা উচিত। সেই ১৯৪০-এর দশকে বেঙ্গল আর্টিস্টস্ অ্যাসোসিয়েসন-সহ শিল্পী-কলাকুশলীদের ট্রেড ইউনিয়নের সূচনা করেছিলেন তিনিই। তা ছাড়া 'ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অফ হিস্টোরিয়ান্স অফ দি লেবার মুভমেন্ট'-এর কার্যকরী সমিতির সদস্য হিসেবে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস প্রণয়নের কাজে তিনি বিশেষ সক্রিয়তা দেখিয়েছেন। এ রাজ্যেও অনুরূপ একটি সংগঠন তিনি গড়ে তুলেছিলেন।

সবশেষে, একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলে শেষ করি। আমাদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টি (পার্টিগুলি) কখনই প্রকৃত অর্থে সুভাষচন্দ্র বসুর সামগ্রিক একটি মার্কসবাদী মূল্যায়ন করেন নি। অথচ, আগেই বলেছি, 'জনযুদ্ধের যুগে' তারা সুভাষকে ভ্রান্তভাবে চিহ্নিত করেছেন। পরবর্তীকালে প্রায় সেই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেই সত্তরের দশকে সরোজ দত্ত একই ধরনের মূল্যায়ন করেছেন। অথচ সংসদীয় কমিউনিস্ট পার্টি নামধারীরা ভোটের সুবিধার্থে রাতারাতি ভোল পাল্টে ১৯৫০-পরবর্তীকালে তারা সুভাষ সম্পর্কে 'ভুল করেছিলাম' বলে ক্রিশ্চান-সুলভ কনফেশন করতে দ্বিধা করেন নি। এই প্রেক্ষিতে ১৯৭৮-এ এই '*অনীক*' পত্রিকাতেই আমি 'তরুণ রায়' নামে সুভাষচন্দ্র বসুর সামগ্রিক একটি মার্কসবাদী মূল্যায়ন করার চেষ্টা করি। পরবর্তীকালে সেটি পড়ে সুধীদা শুধু আমাকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজে বৃদ্ধ বয়সে জার্মানি গিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউরোপে সুভাষচন্দ্রের প্রকৃত অবস্থান ও ভূমিকা কী ছিল, সে সম্পর্কে আর্কাইভ থেকে সদ্যপ্রকাশিত প্রাসঙ্গিক সব তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁর 'সুভাষচন্দ্র ও অক্ষশক্তি' গ্রন্থটিতে সেই সব তথ্য সংগৃহীত করে তিনি সবাইকে অসীম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

তথ্যসূত্র

১। হেমাঙ্গ বিশ্বাস (মোহন মুর্মু) : 'অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক যুক্তফ্রন্টের স্বরূপ ও সমস্যা', *অনীক* (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর বিশেষ সংখ্যা ও ডিসেম্বর সংখ্যা, ১৯৭৩) সংকলিত: '*অনীক পঁচিশ বছর*' : *প্রবন্ধ সংকলন*, ১৯৮৯

২। সুধী প্রধান : গণনাট্য ও অন্য থিয়েটার, সংকলিত : সংস্কৃতির অস্ত্ররূপ, পুস্তক বিপণি।

৩। Sudhi Pradhan (ed.) : *Marxist Cultural Movement in India*, Vol. I, II, III

৪। দীপ্তি চন্দ : 'গণনাট্য থেকে গ্রুপ থিয়েটার : পশ্চিমবঙ্গে নাট্য আন্দোলনের ধারা', *অনীক*, আগস্ট ১৯৯৩

৫। সুদেষ্ণা চক্রবর্তী : 'সুধী প্রধান : কিছু স্মৃতি ও স্বপ্ন', *অনীক*, জানুয়ারি ১৯৯৮

পত্রিকা সংক্রান্ত ঘোষণা

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (১৯৫৬)
নিয়মাবলীর ৮নং ধারা অনুযায়ী

পত্রিকার নাম q অনীক
প্রকাশের স্থান q প্রযত্নে: পিপল্‌স বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার
কলকাতা ৭০০০০৯
প্রকাশকাল q মাসিক
প্রকাশক, মুদ্রক, সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীর নাম, জাতীয়তা ও ঠিকানা — দীপংকর চক্রবর্তী। ভারতীয় শ্যাম বিহার। রঘুনাথপুর। কলকাতা - ৭০০ ০৫৯

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

শতবর্ষে স্মরণ

শতবর্ষের আলোকে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

সুস্মিতা রায়চৌধুরী (মৈত্র)

১৯১১ সালের ১৮ নভেম্বর জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের জন্ম। পিতা যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র ছিলেন শিতলাই এস্টেটের জমিদার, যা বর্তমানে বাংলাদেশে। মাতা সরলা দেবী শ্রীরামপুরের রাজা কিশোরিলাল গোস্বামীর কন্যা। পিতৃ ও মাতৃকুল উভয়ই ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবার। মামা তুলসী চন্দ্র গোস্বামী ছিলেন তুখোড় ব্যারিস্টার, সুবক্তা ও কংগ্রেসের Big Five-র অন্যতম সদস্য।

পিতা যোগেন্দ্রনাথের শিক্ষা শৈশব থেকেই জ্যোতিরিন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল। স্বদেশী ভাবধারায় দীক্ষিত যোগেন্দ্রনাথ তাঁর সন্তানদের অত্যন্ত সাধারণভাবে মানুষ করেছিলেন। জমিদারি ঠাটবাটের কোন বাড়াবাড়ি ছিল না মৈত্র পরিবারের শিতলাই হাউসে। পড়াশুনো এবং গান-বাজনার সুস্থ পরিবেশে তাই বেড়ে ওঠা। যোগেন্দ্রনাথ নিজে একাধিক বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারতেন। বাড়িতে বসত শাস্ত্রীয় সংগীতের আসর। বিখ্যাত গায়ক-বাদকরা আসতেন। কাকা হরিচরণ চক্রবর্তীর কাছে শুরু হয় গানের শিক্ষা। খেলাধুলোর চর্চাও নিয়মিতভাবে চলত। এইরকম সর্বাঙ্গীন সমতা বজায় রেখে গড়ে উঠেছিল জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর ব্যক্তিসত্তা।

যোগেন্দ্রনাথ যুক্ত ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে। তাই বাড়িতে বিপ্লবীদের আনাগোনা চলত নিয়মিত। নিজে চরকা কেটে গামছা, ধুতি ইত্যাদিও তৈরি হত। গান্ধীজী শিতলাই হাউসের আতিথ্য গ্রহণ করেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুও যোগেন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং পাবনার শিতলাই হাউসে যান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একাধিকবার পাবনায় যান। তাঁদের পরিবারের শিলাইদহ এস্টেট ছিল শিতলাই এস্টেটের পদ্মাপারের বাড়ির বিপরীত পাড়ে। তাঁর ছিন্নপত্রাপলীর অনেকগুলি রচিত হয় শিতলাই হাউসের বজরায় বসে। পরবর্তীকালে জ্যোতিরিন্দ্রের সৌভাগ্য হয় রবীন্দ্রনাথ এবং ইন্দিরা দেবীর স্নেহধন্য হবার।

শিতলাই হাউসের স্বাদেশিকতা ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে পুষ্ট জ্যোতিরিন্দ্র কলকাতায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে আসেন। পিতার ডাক্তার বা চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট করার সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ করেন স্বভাবকবি জ্যোতিরিন্দ্র। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রকে পরিবর্তন করে তিনি সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করেন, ইংরাজি সাহিত্য পড়তে নিয়ে। পাবনার বাড়ির বিশাল লাইব্রেরিতে তাঁর পরিচয় হয়েছিল বিশ্বসাহিত্যের সাথে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর করতে দিয়ে সহপাঠী হিসাবে পান বিষ্ণু দে, প্রণতী রায়চৌধুরী (দে), ক্ষিতিশ রায়কে। পরবর্তীকালে এঁদের সাথে এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়, যা পারিবারিক স্তরে আজও অটুট।

সাহিত্য পাঠ এবং চর্চার সাথে সাথে চলে প্রথাগত উচ্চাঙ্গ সংগীত শিক্ষা— বাদল খাঁ এবং ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষা করেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, অনাদি দস্তিদার, দিনু ঠাকুর, শান্তিদেব ঘোষ ইত্যাদি কিংবদন্তী ব্যক্তিত্বদের কাছে। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য সংগীতের প্রতিও তাঁর অনুরাগ জন্মায় এবং তার সাথে পরিচিত হন।

আপাদমস্তক কবি-শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র কিন্তু শিতলাই হাউসের জমিদারি পরিমণ্ডলে বসে মনের সুখে কাব্য রচনা করে এবং সংগীতচর্চা করে দিন কাটানোর মানসিকতা পোষণ করেননি। তিনি তাঁর কবি-শিল্পী সত্তাকে ভাগ করে নিয়েছেন, ছড়িয়ে দিয়েছেন লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে।

জ্যোতিরিন্দ্র তাঁর গান নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ৪৬-এর মন্বন্তরের বুভুক্ষু মানুষের পাশে। 'নবজীবনের গান' একদিকে যেমন সেই নিষ্ঠুর দুর্ভিক্ষের এক জ্বলন্ত দলিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বর্বরতার অসহ্য বর্ণনা— তেমনি আবার গভীর সংকটের মধ্যে বেঁচে থাকার এক আশ্বাসবাণী। রবীন্দ্রোত্তর যুগের একমাত্র বাংলা অপেরা 'নবজীবনের গান' গেয়ে গ্রামে গঞ্জে ঘুরেছেন জ্যোতিরিন্দ্র। গিয়েছেন বাংলা এবং ভারতবর্ষের দূর-দূরান্তে। সঙ্গে পেয়েছেন শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, রবিশঙ্কর, বিনয় রায়, দেবব্রত বিশ্বাস, সলিল চৌধুরীর মতো দিকপালদের।

একদিকে যেমন সৃষ্টি করেছেন কথা এবং সুরের অপূর্ব সংমিশ্রণে নবজীবনের গান, অন্যদিকে আধুনিক জীবনের অবক্ষয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা এবং অসারতা ফুটিয়ে তুলেছেন 'মধুবংশীর গলি' কবিতায়। নিজের অভিজ্ঞতাও স্থান পেয়েছে এই কাব্যে। ''বাঁকা টুপি পরা কোনো আমেরিকান কাপ্তানের লোলুপ শিস...'' কবির পরিচিত ছবি।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কাজককর্মের পুরোভাগে ছিল তাঁর রাজনৈতিক চেতনা ও চিন্তাধারা। কলকাতায় কলেজে পড়াকালীন তিনি মার্কসবাদী চিন্তাধারায় প্রভাবিত হন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহযোদ্ধা চিন্মোহন সেহানবীশ তাঁর সঙ্গী ছিলেন। ১৯৪২ সালে 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-তে যোগ দেন। তাঁর এবং তাঁর সমসাময়িক শিল্পী, কবি, নাট্যকার এবং বহু গুণিজনের প্রিয় আস্তানা ছিল ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিট। এই ঐতিহাসিক ঠিকানায় চলত মহড়া, আলোচনা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের দিকপালদের আনাগোনা।

১৯৪৩ সালে বোম্বাইতে 'গণনাট্য সংঘ' প্রতিষ্ঠা হয়। জ্যোতিরিন্দ্র তার প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের একজন। এই সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিনয় রায় রবিশঙ্কর, সলিল চৌধুরী, প্রীতি বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ। মহারাষ্ট্রের অম্বরনাথও ছিলেন কয়েক মাস। বামপন্থী আন্দোলনের সাংস্কৃতিক বিভাগ ছিল 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষক, কুলি, মজুর সবাইকে গান, নাটক, কবিতা নানা মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করত এই 'Cultural Squad'। জ্যোতিরিন্দ্র বিভিন্ন ভাষায় লোকগীতি গাইতে পারতেন, ভালবাসতেন সেগুলি গেয়ে শোনাতে। গণনাট্য সংঘের কেন্দ্রীয় দলের আন্ধেরির (মুম্বাই) শাখাতে যুক্ত ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র। শোনা যায় একবার কলকাতার বাড়ি থেকে বাড়ির কাজে বেরিয়ে হঠাৎ করে বোম্বাই থেকে জরুরি তলব নিয়ে কেউ আসাতে উনি সোজা বোম্বাই পাড়ি দেন। পথে চেনা একজনকে বলে দেন খবরটা বাড়িতে জানিয়ে দিতে।

এই সময় জ্যোতিরিন্দ্র পূরণ চন্দ যোশীর সংস্পর্শে আসেন। যাঁকে P C বলে উল্লেখ করা হত। ১৯৪২ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র। আজীবন তাঁর আদর্শে অটল ছিলেন। বহু কবিতা, গানও রচনা করেছেন কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-র কর্মময় প্রাণচঞ্চল জীবনে সৃষ্টির স্রোত অজস্র ধারায় বর্ষিত হয়েছে। সৃজনশীল এই মানুষটি জীবনের শেষ পর্যন্ত সৃষ্টির কাজে ব্যাপৃত ছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-র গান

এসো মুক্ত করো

এসো মুক্ত করো, মুক্ত করো, অন্ধকারের এই দ্বার,
এসো শিল্পী, এসো বিশ্বকর্মা, এসো স্রষ্টা
রসরূপ মন্ত্র দ্রষ্টা,
ছিন্ন করো, ছিন্ন করো বন্ধনের এ অন্ধকার ।।

দিকে দিকে ভেঙেছে যে শৃঙ্খল,
দুর্গত দলিতেরা পায় বল।
এ শুভ-লগ্নে তাই তোমারে স্মরণ করি
রূপকার
এসো মুক্ত করো হে এই দ্বার ।।

উঠেছে যে জীবনের লক্ষ্মী মৃত্যু সাগর মন্থনে,
নূতন পৃথিবী চায় শিল্পীর বরাভয় নব সৃষ্টির
শুভক্ষণে।

এসো সমিতির সাম্যে ও ঐক্যে,
এসো জনতার মুখরিত সখ্যে,
এসো দুঃখ তিমির ভেদি দুর্গম ধ্বংসের
নিষ্ঠুর ভয় করি চূর্ণ
(এসো) প্রাণের ভবন করো পূর্ণ ।।

শতবর্ষে দেবব্রত বিশ্বাস

২৮ পৃষ্ঠার পর

দশক পেরিয়ে এসেও 'মিউজিক ওয়ার্ল্ড'-এর প্রদত্ত হিসেব অনুযায়ী রবীন্দ্রসংগীতের সিডি বিক্রির হিসাবে দেবব্রত তাঁর কয়েক প্রজন্ম পরের নবীনতম গায়ক-গায়িকাদের চেয়েও বেশ কয়েক কদম এগিয়ে আছেন। তাঁর বিতর্কিক জীবন, অনাড়ম্বর জীবনচর্যা নিয়ে তৈরি হচ্ছে নাটক 'রুদ্ধসংগীত'। শুধুমাত্র একটি নাম— দেবব্রত বিশ্বাস-এর অমোঘ টানেই প্রজন্ম নির্বিশেষে দর্শক প্রেক্ষাগৃহে ভিড় জমিয়েছেন। এবং এখানেই নতুন এক আশঙ্কাও তৈরি হয় যে, দেবব্রতর আজীবন প্রতিবাদী চরিত্রটি তুলে ধরতে দিয়ে নাটকটিতে কখনও কখনও নামভূমিকায় অভিনেতার মুখে এমন কিছু সংলাপ তুলে ধরা হয়েছে, যা ইতিহাসের কালানুক্রমিক ঘটনাক্রমে অপ্রাসঙ্গিক। তাছাড়া এই নাটকে কোথাও কোথাও কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে দেবব্রতর দ্বন্দ্বের কারণ হিসাবে পার্টির উপরমহলের অতিরিক্ত মাতব্বরি ও তজ্জনিত মতাদর্শগত যে পার্থক্যের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে, 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত'-এ দেবব্রতর জবানবন্দী কিন্তু এই তত্ত্বে সায় দেয় না। কারণ তিনি নিজেই বলেছেন যে, ভাঙনের সময় দু-পক্ষেই তাঁর বন্ধুবান্ধব ছিলেন, ফলে কোন্ পক্ষে তাঁর যাওয়া উচিত তা তিনি অমীমাংসিতই রেখে দেন। সুতরাং জীবনের শেষ পর্বে দেবব্রত বামপন্থী মতাদর্শের বিরোধী অবস্থানে চলে দিয়েছিলেন— এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কার্যত অনৈতিক ও সুপরিকল্পিত ইতিহাস-বিকৃতি। হয়তো বিশ্বভারতীর কাছে 'ব্রাত্য' দেবব্রতর গণমুখী জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার করার এ-ও এক বাণিজ্যিক রূপ। তাই সতর্ক থাকতেই হয় যে, দেশ-কাল-সমাজের ইতিহাসের বিশ্লেষণে ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকার সামান্যতম বিকৃত উপস্থাপনাও নবীনতম প্রজন্মের কাছে পূর্বসূরীর সঠিক মূল্যায়নের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে। তথাপি, নানা বিতর্কের কেন্দ্রে থেকেও মৃত্যুর পর তিরিশ বছর পেরিয়ে এসেও এভাবেই সমানে প্রাসঙ্গিক থেকে যাওয়া দেবব্রত বিশ্বাস আজ কিংবদন্তী, বাঙালির রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসংগীত চর্চার এক অনিবার্য সেতু।

সহায়ক গ্রন্থাবলী:

১। *ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত* : দেবব্রত বিশ্বাস, করুণা প্রকাশনী, (সপ্তম সংস্করণ), কলকাতা, ২০০১
২। *ব্যাকুল বাঁশরি* : অলক চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), আজকাল, কলকাতা, ২০১১
৩। *আমি চঞ্চল হে* : স্বপন সোম, সূত্রধর, কলকাতা, ২০১১
৪। *ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা : দেবব্রত বিশ্বাসের জীবন ও গান* : শ্যামল চক্রবর্তী (সম্পাদিত), অক্ষর পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১১

নারীদিবস, ফেব্রুয়ারি ১৯১৩

আলেক্সান্দ্রা কলন্তাই

আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে ৮ মার্চ রাশিয়ায় প্রোলেতারিয়েত নারীদের প্রথম আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রাভদায় প্রকাশিত হয় আলেক্সান্দ্রা কলন্তাই-এর এই প্রবন্ধটি। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের একশত বর্ষ পূর্তিতে আজও প্রাসঙ্গিক এই ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি আমরা প্রকাশ করছি।

'নারী দিবস' কী? তার কি সত্যি সত্যি কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে? বুর্জোয়া শ্রেণীর নারীদের জন্য, নারীবাদী ও সাফ্রাগেটদের (নারীদের ভোটাধিকারের জন্য সংগ্রামরত মূলত বুর্জোয়া নারীদের জোট— অনুবাদক) জন্য একটি বিশেষ ছাড় নয় কি এটি? শ্রমিক আন্দোলনের ঐক্যের ক্ষেত্রে এটি কি ক্ষতিকর নয়?

এসব প্রশ্ন এখনো রাশিয়ায় শোনা যায় (আজও শোনা যায়, অন্তত ভারতবর্ষে— অনুবাদক), যদিও বাইরে এ কথাগুলি আর শোনা যায় না। জীবন ইতিমধ্যেই এর পরিষ্কার উত্তর দিয়ে দিয়েছে।

প্রলেতারিয়েত নারী আন্দোলনের দীর্ঘ ও শক্তিশালী ঘটনাপ্রবাহে 'নারী দিবস' একটি সংযোগ সূত্র। কর্মরত নারীদের সংগঠিত বাহিনী প্রতি বছর বেড়ে চলেছে। কুড়ি বছর আগে ট্রেড ইউনিয়নে ছিল এখানে ওখানে শুধু ওয়ার্কার্স পার্টির মধ্যেকার কর্মরত নারীর কয়েকটি দল।... এখন ইংলন্ডে ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে নারীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৯২ হাজার ছাড়িয়ে গেছে; জার্মানিতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ২ লক্ষের মতো আর ওয়ার্কার্স পার্টিতে দেড় লক্ষের মতো; অস্ট্রিয়ায় ট্রেড ইউনিয়নে ৪৭ হাজার আর পার্টিতে প্রায় ২০ হাজার। ইতালিতে, হাঙ্গেরিতে, ডেনমার্কে, সুইডেনে, নরওয়েতে, সুইজারল্যান্ডে— সর্বত্র শ্রমিক শ্রেণীর নারীরা সংগঠিত হচ্ছেন। সমাজতন্ত্রী নারী বাহিনীর সদস্য সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ। শক্তিশালী একটি বাহিনী! জীবনযাপনের ব্যয়, মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা, শিশু শ্রমের প্রশ্নে এবং নারী শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য আইনের প্রশ্নে এই বাহিনীকে গুরুত্ব দিতে বাধ্য বিশ্বের শাসকরা।

একটা সময় ছিল যখন শ্রমজীবী পুরুষরা মনে করতেন যে পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভার তাঁদের একার কাঁধেই বহন করতে হবে, একাই তাঁদের 'পুরনো বিশ্বের' সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে— নারীদের সাহায্য ছাড়াই। কিন্তু, শ্রমিক শ্রেণীর নারীরা যখন শ্রমবিক্রেতাদের দলে ঢুকলেন, প্রয়োজনের তাগিদে শ্রমের বাজারে ঢুকতে বাধ্য হলেন, বাধ্য হলেন কারণ তাঁদের স্বামী বা পিতা হয়ত বেকার, শ্রমিক পুরুষরা তখন বুঝলেন যে 'শ্রেণী-চেতনাহীন' হিসাবে নারীদের পেছনে ফেলে রাখলে তাঁদের কাজ ব্যাহত হবে, পিছিয়ে পড়বে। সচেতন যোদ্ধার সংখ্যা যত বাড়বে, সাফল্যের সম্ভাবনাও তত বাড়বে। উনুনের ধারে বসে থাকেন যে নারী, সমাজে, রাষ্ট্রে বা পরিবারে যার কোনো অধিকার নেই, তাঁর সচেতনতার মান কী হবে? তাঁর নিজস্ব কোনো 'ধ্যানধারণা' নেই। বাবা বা স্বামীর নির্দেশেই সবকিছু চলে।

নারীদের পিছিয়ে থাকা ও অধিকারহীনতা, তাদের পরাধীনতা ও উদাসীনতা শ্রমিক শ্রেণীর কোনো সুবিধা করে না, বরং ক্ষতি করে। কিন্তু নারী শ্রমিকদের কী ভাবে আন্দোলনে টেনে আনা যাবে, কী ভাবে তাদের জাগানো যাবে?

বিদেশে সমাজগণতন্ত্র এর চটজলদি সঠিক সমাধান খুঁজে পায়নি। শ্রমিক সংগঠনগুলি নারী শ্রমিকদের জন্য অবারিতদ্বার হলেও খুব কম জনই তাতে যোগ দেন। কেন? কারণ, প্রথমে শ্রমিক শ্রেণী বুঝতে পারেন নি যে নারী শ্রমিকরা হলেন আইনগত ও সামাজিক দিক দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর সবচেয়ে বঞ্চিত সদস্য, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাঁদের চোখ রাঙিয়ে, ভয় দেখিয়ে, অত্যাচার করে যাওয়া হয়েছে; তাঁদের মনকে, তাঁদের হৃদয়কে উজ্জীবিত করতে দরকার দৃষ্টিভঙ্গি দরকার, দরকার এমন শব্দগুচ্ছ যা নারী হিসাবে তাঁদের বোধগম্য হবে। শ্রমিকরা প্রথম প্রথম বুঝতে পারেন নি যে অধিকারহীনতা ও শোষণের এই বিশ্বে নারী শুধু তার শ্রমের বিক্রেতা হিসাবেই শোষিত হয় না, শোষিত হয় মা হিসেবেও, নারী হিসেবেও।... কিন্তু শ্রমিকদের সমাজতান্ত্রিক পার্টি যখন সেটা বুঝতে পারল, তারা ভাড়া-খাটা শ্রমিক হিসেবে এবং নারী হিসাবে, মা হিসেবে— দুভাবেই নারীর পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে গেল।

সব দেশের সমাজতন্ত্রীরাই নারী শ্রমিকের বিশেষ সুরক্ষা, মা ও শিশুর সুরক্ষা-ব্যবস্থা, নারীদের রাজনৈতিক অধিকার ও নারীদের স্বার্থ রক্ষার দাবি তুলতে শুরু করল।

শ্রমিক পার্টিগুলি নারী শ্রমিক নিয়ে তাদের এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটা যত পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারল নারী শ্রমিকরা ততই স্বেচ্ছায় পার্টিতে যোগ দিল, আর ততই তারা (নারী শ্রমিকরা) বুঝল যে পার্টিই তাদের আসল রক্ষক, আর তাদের জরুরি ও একান্তই নারীসুলভ প্রয়োজনের জন্যও লড়ছে শ্রমিক শ্রেণী। শ্রমিক নারীরা নিজেরা সংগঠিত ও সচেতন হয়ে এই লক্ষ্যটিকে স্পষ্ট করতে বিশাল ভূমিকা রেখেছে। এখন আরও বেশি নারী শ্রমিককে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে আকর্ষিত করার মূল দায়িত্বটা বর্তেছে নারীদের ওপরই। প্রতিটি দেশের পার্টিরই নিজস্ব বিশেষ নারী কমিটি, নারী সেক্রেটারিয়েট ও নারী ব্যুরো রয়েছে। এখনও মূলত রাজনৈতিকভাবে অসচেতন নারীদের মধ্যে কাজ করে এই নারী কমিটিগুলি, তাদের সচেতনতা বাড়ায় ও সংগঠিত করে। নারীদের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন ও দাবিগুলি পর্যালোচনা করে তারা— যেমন গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী নারীদের সুরক্ষার ব্যবস্থা, নারী শ্রমিকের জন্য আইনি বিধি, গণিকাবৃত্তির বিরুদ্ধে ও শিশুমৃত্যুর বিরুদ্ধে অভিযান, নারীদের

রাজনৈতিক অধিকারের দাবি, বাসস্থানের উন্নতি, জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি।

এভাবে, পার্টি সদস্য হিসাবে নারী শ্রমিকরা শ্রেণীর সাধারণ স্বার্থে লড়ে, আর একই সাথে নারী হিসেবে, গৃহবধূ ও মা হিসেবে যেসব বিষয় তাদের কাছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সেগুলির, সেই দাবিগুলির রূপরেখা তৈরি করে, সেগুলি সামনে আনে। পার্টি এইসব দাবি সমর্থন করে, তার জন্য লড়াই করে...। নারী শ্রমিকদের প্রয়োজন সাধারণ শ্রমিকস্বার্থেরই অংশ।

নারী দিবসে সংগঠিত সংগঠিত (নারী)-রা তাদের অধিকারহীনতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

অবশ্য অনেকে বলবেন, নারী শ্রমিকদের *আলাদা করা* কেন? কেন বিশেষ 'নারীদের দিবস', নারী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ লিফলেট, শ্রমিক শ্রেণীর নারীদের জন্য বিশেষ সভা ও সম্মেলন? শেষ বিচারে এটা কি নারীবাদী ও বুর্জোয়া সাফ্রাগেটদের জন্য ছাড় নয়?

সমাজতান্ত্রিক নারী ও বুর্জোয়া সাফ্রাগেটদের আন্দোলনের মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্য (radical difference) যারা বোঝে না, তারাই কেবল এরকম ভাবতে পারে।

নারীবাদীদের লক্ষ্য কী? তাদের লক্ষ্য হলো পুঁজিবাদী সমাজে তাদের স্বামী, পিতা ও ভাইরা এখন যেরকম সুবিধা, ক্ষমতা ও অধিকার ভোগ করে সেই একই সুবিধা, একই ক্ষমতা, একই অধিকার ভোগ করা। নারী শ্রমিকদের লক্ষ্য কী? তাদের লক্ষ্য হলো জন্ম বা সম্পত্তিসূত্রে পাওয়া সব ধরনের সুবিধার বিলুপ্তি। মনিব নারী কি পুরুষ, নারী শ্রমিকের কাছে তা অবান্তর। তার শ্রেণীর অন্য সবার সাথে সে (নারী শ্রমিক) শ্রমিক হিসেবে তার অবস্থানে স্বচ্ছন্দ।

সবসময় ও সর্বত্র সমান অধিকার দাবি করে নারীবাদীরা। নারী শ্রমিকরা জবাব দেয়: আমরা নারী-পুরুষ প্রতিটি নাগরিকের অধিকার দাবি করি। কিন্তু একথা আমরা ভুলতে প্রস্তুত নই যে আমরা শুধুমাত্র শ্রমিক আর নাগরিক নই, সেইসঙ্গে মা-ও। আর মা হিসাবে, ভবিষ্যতের জন্য সন্তানের জন্মদাত্রী নারী হিসাবে আমাদের নিজেদের জন্য ও আমাদের সন্তানদের জন্য বিশেষ মনোযোগ দাবি করি, রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে বিশেষ সুরক্ষা দাবি করি।

নারীবাদীরা রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের জন্য চেষ্টা করে। এখানেও আমাদের পথ আলাদা।

বুর্জোয়া নারীর কাছে রাজনৈতিক অধিকার হলো শ্রমজীবী মানুষের শোষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত দুনিয়ায় আরো সুবিধাজনকভাবে, আরো সুরক্ষিতভাবে চলার অধিকার। আর নারী শ্রমিকদের কাছে রাজনৈতিক অধিকার হলো তাদের আকাঙ্ক্ষিত শ্রমের রাজত্বে পৌঁছনোর পাথুরে ও কঠিন যাত্রাপথে একটি ধাপ।

নারী শ্রমিক ও বুর্জোয়া সাফ্রাগেটদের পথ অনেক আগেই আলাদা হয়ে গেছে। জীবন তাদের সামনে যে লক্ষ্য উপস্থিত করেছে তাতে তফাত বড় বেশি। নারী শ্রমিকদের স্বার্থ ও নারী মালিকদের স্বার্থে, দাসী আর মালকিনের স্বার্থে ফারাক বড় বেশি। তাদের মধ্যে কোনো সংযোগবিন্দু, সমঝোতা বা মিলনবিন্দু স্থান নেই। শ্রমিক পুরুষদের তাই পৃথক নারী দিবস নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, ভয় পাওয়ার নেই নারী শ্রমিকদের বিশেষ সম্মেলন বা বিশেষ পত্রপত্রিকা থেকে।

শ্রমিক শ্রেণীর নারীদের মধ্যে প্রতিটি বিশেষ ধরনের কাজ আসলে নারী শ্রমিকদের সচেতনতা বাড়ানো উপায়, উন্নত ভবিষ্যতের জন্য লড়াইয়ে তাদের টেনে আনার উপায়।... নারী দিবস ও নারী শ্রমিকদের আত্মসচেতনা জাগরুক করার জন্য ধীর পুঙ্খানুপুঙ্খ কাজ শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিভাজনে নয়, ঐক্যে সাহায্য করে।

শ্রেণীর সাধারণ স্বার্থে কাজ ও একই সাথে নিজেদের নারী মুক্তির জন্য কাজ করার আনন্দ নারী শ্রমিকদের নারী দিবস পালনে উদ্বুদ্ধ করুক।

সংবাদমাধ্যমের দায় : ঝুলির বেড়ালটা সামলে

৮ পৃষ্ঠার পর

যুগকে নাম দিয়েছেন 'পলাশী লুণ্ঠন'... 'সম্পদ নিঃসরণ'... প্রকাশ্য ও নির্লজ্জ দস্যুবৃত্তি'। তবে এজন্য কোম্পানির দরকার হয়েছিল ১৭৫৭-র পলাশী যুদ্ধ... ১৭৬৪-র বক্সার যুদ্ধ। নবাবরা কোম্পানিকে ওয়াক ওভার দেয়নি। আমরা নির্বিবাদে স্বেচ্ছায় মুরগি বনবো! তাই কি!

বিবেকবাণীর মঞ্চে বিশ্বজয়ের স্মৃতি জাগাতে মহামান্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এখন মার্কিন মুলুকে। ভারতের কৃষক কারিগর উৎপাদক-এর লাভের চিন্তায় ওবামা প্রশাসনের ঘুম নেই... ফলে প্রণববাবুও নিদ্রাহীন। ''মার্কিন বিদেশ দফতরের সহসচিব রবার্ট ব্লেক কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন, কবে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের বিষয়টি ছাড়পত্র পাবে? প্রণববাবু তাদের ধৈর্য ধরতে বলেন।'' ...''দাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে কেন্দ্রীয় শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী আনন্দ শর্মাও ওয়ালমার্ট-সহ বহুজাতিক-গুলিকে এই নিয়ে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন।'' ভাবুন একবার, মার্কিন পুঁজিপতিও ভারতের কৃষক মজুরের চিন্তায় উদ্বিগ্ন। ''...কথা বলেছেন মার্কিন বিদেশ সচিব হিলারি ক্লিন্টনের সঙ্গে। মার্কিন শিল্পমহলকে বলেছেন 'বহুব্র্যান্ডের খুচরো ব্যবসার দরজাটা আমরা এখনও পুরোপুরি খুলতে পারিনি... প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছি'। খুচরো ব্যবসায় ভারতের বিরাট বাজার ধরতে যারপরনাই মরিয়া মনোভাব দেখাচ্ছে মার্কিন শিল্প সংস্থাগুলি।'' ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কৃষক-কারিগর প্রেম আমরা দেখেছি বইয়ের পাতায়। ওয়ালমার্ট আর ওবামার কৃষক প্রেম দেখতে অপেক্ষা করুন। সঙ্গে থাকুন। শিকাগো থেকে প্রণব মুখোপাধ্যায় সফরসঙ্গী অগ্নি রায়ের রিপোর্ট। এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে! (৩০শে জানুয়ারি, ২০১২, আ.বা.প.)